নতুন দিনের রুশ কবিতা

মনীন্দ্র রায় অনূদিত

নতুন দিনের রুশ কবিতা

নতুন দিনের রুশ কবিতা

১৯১৭-১৯৬৭

মণীন্দ্র রায়
অনূদিত

মনীষা ॥ কলিকাতা
১৯৬৭

প্রকাশ
৭ নভেম্বর ১৯৬৭

প্রচ্ছদপট : সুবোধ দাশগুপ্ত

প্রকাশক
তরুণ সেনগুপ্ত
৪/৩ বি বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রক
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি
প্রাইভেট লিমিটেড
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ১২

তিন টাকা

রুশ কবিতার কথা

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কাব্য-সাহিত্যের মতোই রুশ কবিতারও উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে লোককাব্যে। পুশকিনের হাতেই উনিশ শতকের প্রথম দিকে এ কাব্যে আধুনিকতার গোড়াপত্তন ঘটে এবং একে তিনি প্রবল বিপুল প্রাণোচ্ছলতায় অবিস্মরণীয় করে তোলেন।

পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭) রোম্যান্টিক কবি। সেকালে অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথম ভাগে রোম্যান্টিকতার মধ্যে ছিল বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের অন্তঃসার। তার মধ্যে আতিশয্যও ছিল, বিকারও ছিল। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে যে সমাজজীবন তখন অতি দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছিল সামন্তযুগ থেকে যন্ত্রযুগের দিকে। তাতে ব্যক্তি-মানুষ যেমন পুরনো সমাজের আত্মলোপকারী কাঠামো থেকে মুক্তি পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠল, তেমনি আগেকার সমাজ-কাঠামোর সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে অসহায়ও বোধ করছিল। তাই সে-যুগের রোম্যান্টিকতায় একই সঙ্গে দেখা যায় মানবমুক্তির জয়গান, আর মানসিক শূন্যতার বিষাদ। আর এরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে লক্ষ্য করা যায় একধরনের উভচারিতা। ফলে সেকালের রোম্যান্টিক কবিতায় একই সঙ্গে পাওয়া যাবে দেশ-বিদেশের জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে ঐকান্তিকতা, গ্রামীণ-জীবনের সৌন্দর্যের দিকে ব্যাকুলতা, নগরজীবনের নিঃসঙ্গতার ফলে পীড়াবোধ, প্রেমের জন্যে অপরিসীম আকূতি এবং নিছক ইচ্ছাপূরণ বা কাম-তান্ত্রিকতায় এই-সব অস্থির চিত্তবিকার থেকে পরিত্রাণ পাবার আগ্রহ। আমাদের পরিচিত ইংরেজী কবিতায় ওয়ার্ড্‌স-ওয়ার্থ, বায়রন, শেলি ও কীট্‌সের রচনাবলীতে এই-সব মনোভাব কখনো একক-ভাবে আবার কখনো বা বিমিশ্রভাবে লক্ষ্য করা যাবে।

পুশকিন এবং তাঁর পর লেরমন্তভের (১৮১৪-৪১) হাতে রচিত একালের রুশ কবিতার মধ্যে রোম্যান্টিকতার এই-সব চরিত্রলক্ষণ সুস্পষ্ট। আর এদিকে পুশকিনের কালে কিছুদিন অন্তত এঁদের আদর্শ হয়ে উঠেছিলেন বায়রন— তাঁর মানবিক স্বাধীনতার জয় ঘোষণা ও প্রবল দেহজ কামনার পুরুষালির জন্যেই খুব সম্ভবত।

অবশ্য আগেই বলা হয়েছে, রোম্যান্টিকতা একটি যুগলক্ষণ এবং তার তলায় রয়েছে যন্ত্রযুগের পীড়নের বিরুদ্ধে মানবিক প্রতিবাদের আগ্রহ। এই সাধারণ যুগলক্ষণেরই প্রকাশ দেখা গেছে ইংল্যাণ্ডের বায়রন-শেলির কাব্যে, ফ্রান্সের

বদলেয়ারের কবিতাবলীতে, জার্মানীর হাইনের রচনাগুচ্ছে এবং রুশ দেশের পুশকিন-লেরমন্তভের কবিতায়।

অবশ্য এ আলোচনা শতাব্দীর পর্বে পর্বে মিলিয়ে রুশ কবিতার ধারাবাহিক বিবরণ উপস্থিত করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। কেননা আমি রুশ ভাষা জানি না। রুশ কবিতা যেটুকু যা পড়েছি সবই অনুবাদের সাহায্যে এবং সকলেই জানেন, অনুবাদের ভিতর দিয়ে মূল কবিতার ঐশ্বর্য ও আস্বাদ পুরোপুরি পাওয়া কঠিন। তবু, এ বইতে যে কবিতাগুলির অনুবাদ উপস্থিত করা হয়েছে তার পটভূমি হিসাবে রুশ-বিপ্লবের পূর্ববর্তী আমলের কাব্য-সাহিত্যের প্রধান প্রবণতাগুলি মোটামুটি উল্লেখ করা দরকার।

পুশকিন-লেরমন্তভের রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাসের ভাবময়তার প্রায় সমসাময়িকই দেখা দেয় নেক্রাসভের (১৮২১-৭৭) বাস্তবমুখী সার্বজন্য কবিতা, সিভিক কবিতা বলা হয় যাকে এখন, আর এতে খেটে-খাওয়া মানুষের কথাও স্থান পায় সগৌরবে। কিন্তু সেকালে জার-শাসিত রাশিয়ার মতো একটি পিছিয়ে থাকা দেশে এ ধরনের নতুন মূল্যবোধের 'আধুনিকতা' বাস্তব-সমর্থন পায় নি। আর সেইজন্যেই বোধকরি শতাব্দী-শেষে দেখা দেয় অবক্ষয়ের কবিতা, যার প্রবক্তা হলেন এগারোটি ভাষায় সুশিক্ষিত কবি ব্রুইসভ (১৮৭৩-১৯১৪) এবং কিছুটা বোধকরি আন্নেস্কি (১৮৫৬-১৯০৫)। এঁরা ছিলেন সেকালের সাম্রাজ্যবাদী বণিকসমাজের মতাদর্শে আপ্লুত এবং 'শিল্পের জন্যেই শিল্প' আর 'কবির জন্যেই কবিতা' ধরনের বক্তব্যে বিশ্বাসী।

সকলেই জানেন, সে-যুগে রুশ দেশের শিক্ষিত-সমাজে ফরাসী ভাষা-সাহিত্যের ছিল অপ্রতিহত আধিপত্য। কাজেই প্যারিসের কাব্যান্দোলন অতি সহজেই সাড়া তুলত পেত্রোগার্ড ও মস্কোতে। এটা যে শুধু ফ্যাশানের তাগিদেই ঘটত তা নয়, সমাজবিবর্তনের ধারায় মধ্যযুগীয় রুশ দেশ যত দ্রুত যন্ত্রায়িত হয়ে উঠছিল ততই সে-দেশের ভাবাদর্শে দেখা দিচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও শিল্প-বাণিজ্যের পীঠভূমি হিসেবে নেতৃস্থানীয় সেকালের ফরাসী-সংস্কৃতির প্রভাব। অবশ্য ফরাসী সমাজে সেদিন যেমন পীড়ন ছিল, তেমনি ছিল প্রতিবাদ। আর এই প্রতিবাদেরই কাব্যময় প্রকাশ হিসেবে যে দেখা দেয় রোম্যান্টিকতা সে-কথা আগেই বলেছি। কিন্তু মোটের মাথায় সমাজে তবু বারেবারেই সেদিন অবক্ষয়কে চাপা দেবার চেষ্টাও কম দেখা যায় নি। এর ফলে, ন্যায্য বিকাশের পথ হারিয়ে এবং সম্ভবত কিছুটা নতুন বিজ্ঞান-ভাবিত যুগের নানাবিধ দিগন্ত-উন্মোচনের

প্রসাদে উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ের কবিতায় দেখা দিল 'প্রতীক' ব্যবহারের প্রবণতা। প্রতীকেরই সাহায্যে সে-যুগের কবিরা কেউ কেউ সামাজিক-বিচ্ছিন্নতার সমস্যা থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজেছিলেন এবং চেয়েছিলেন অতীতের সঙ্গে একটা যোগাযোগের পথ তৈরি করতে। কিন্তু অতি চর্চার ফলে, হয়তো সামাজিক কারণেই, অনেকের হাতেই প্রতীকের ব্যবহার হয়ে উঠল নিতান্তই ব্যক্তিগত এবং উৎকেন্দ্রিক, আর তাতে বিচ্ছিন্নতা বাড়ল বই কমল না।

কথাগুলি মনে রাখা দরকার এই কারণে যে রুশ দেশেও উনিশ শতকের শেষে প্রতীকী কবিতার ঢেউ এসে পড়ে এবং এ ধারার শ্রেষ্ঠ কবি আলেকজান্দার ব্লক (১৮৮০-১৯২১) তাবৎ রুশ সাহিত্যেরই একজন প্রধান কবি। প্রতীকী রীতির যা-কিছু উৎকৃষ্ট অবদান তা যেমন ব্লকের কাব্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় তার ব্যর্থতার নমুনা। কিন্তু ব্লক, বড়ো কবি বলেই বোধকরি, ধরতে পেরেছিলেন যুগপরিবর্তনের ইঙ্গিত এবং বিপ্লব সংঘটিত হলে তিনি তাকে অকুণ্ঠ ভাবেই জানান তাঁর ভাবসমর্থন। তবু ব্লকের মধ্যে পুরনো সংস্কৃতির প্রতি মমতা আর নতুনের প্রতি সংশয়ও যেন থেকে যায় শেষপর্যন্ত এবং আশা-নিরাশায় তিনি রক্তাক্ত হতে থাকেন। একেবারে শেষ পর্বে হতাশাই যেন তাঁকে গ্রাস করে ফেলে।

যাই হোক, প্রতীকীদের ভাবালু অস্পষ্টতার প্রতিবাদে রুশ কবিতার ধারায় বিপ্লবের সমসাময়িককালে দেখা দেয় 'অ্যাকমিইস্ত' আন্দোলন। স্পষ্টতা, স্থিরতা এবং আঙ্গিক নির্মাণের দিকেই এ আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের ঝোঁক ছিল বেশি। সেটা সোভিয়েত সমাজের পাঠকদের ভালো লাগে নি। তদুপরি এ দলের প্রধান কবি গুমিলেভ ছিলেন রাজতন্ত্রী, ফলে মৃত্যুদণ্ড লাভ করেন এবং তাঁর স্ত্রী আন্না আখমাতোভা প্রথম দিকে তাঁর সহধর্মিণী হলেও স্বামীর জীবদ্দশাতেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন করে অন্যভাবে গীতিকবিতা লিখতে থাকেন।

ইতিমধ্যে রুশ-বিপ্লবের কিছু আগেই শুরু হয় 'ফিউচারিস্ত' আন্দোলন। এ আন্দোলনও অবশ্য ফ্রান্সের প্রতিধ্বনি, কিন্তু স্থানীয় পরিস্থিতিতে এর চেহারা-বদল ঘটে এবং এর মূল প্রতিবাদের সুর বিকৃত হয়ে উৎকেন্দ্রিকতার মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলে। এঁরা কবিতার উপকরণ, অর্থাৎ শব্দ, চিত্রকল্প ইত্যাদিতে এবং আঙ্গিকে পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে বর্তমান যন্ত্রযুগের কাছাকাছি আনতে চাইলেন। কিন্তু এই-সব সাধু সংকল্প নিয়ে শুরু করেও এঁরা শেষ পর্যন্ত 'নতুন কিছু করো' ধরনের দায়িত্বহীনতাতেই গা ভাসিয়ে দিলেন। প্রথম দিকে এঁদের নেতা ছিলেন মায়াকোভ্স্কি (১৮৯৩-১৯৩০) এবং পাস্তেরনাক (১৮৯০-১৯৬০)। রুশ-বিপ্লবের

সময়ে এবং তারপর এঁদের দুজনের কবিতাই অবশ্য অন্যরকম আকার নেয়। মায়াকোভ্স্কি রুশ ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, পাস্তেরনাকের কবিখ্যাতিও তাঁর পরবর্তী গদ্য রচনার বিতর্কে আবৃত হবার নয়। এঁদের স্বভাবে কিন্তু মিল ছিল না একেবারেই। মায়াকোভ্স্কি উদ্দাম, প্রবল, প্রচারমুখী, বীররসের কবি। আঙ্গিকের অভিনবত্ব তাঁর পদে পদেই স্বপ্রকাশ। উপরন্তু তিনি বিপ্লবের জয়গানে মুখর, যেন বা বিপ্লবেরই তিনি অন্তরাত্মা। তুলনায় পাস্তেরনাক রীতিমত আত্ম-মুখী স্থির এবং রূপায়ণবাদী। ফলে বিপ্লবের পর তাঁকে সমর্থন জানানোর জন্যে মায়াকোভ্স্কির নেতৃত্বে যখন 'লেফ' আন্দোলন শুরু হয় এবং বিপ্লবের জন্যে এমন-কি সাংবাদিকতাকেও কবিকর্ম বলে গ্রহণ করা হয়, তখন পাস্তেরনাক তাতে সায় না দিয়ে আরো বেশি করে আত্মমুখী ও আঙ্গিক-সচেতন হয়ে উঠলেন। এর জন্যে তখন তাঁকে এবং তাঁর অনুবর্তীদের বলা হত 'ফর্মালিস্ত'।

ইতিমধ্যে অবশ্য 'ইমেজিস্ত' ধারা (এঁদের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন এসেনিন—(১৮৯৫-১৯২৫)) প্রতীকী ধারা থেকেই উদ্ভূত হয়ে অবচেতন ও চিত্রকল্পের উপর বেশি ঝোঁক দেবার চেষ্টা করে গেছে। কিন্তু বিপ্লবের পরে 'প্রোলেটকাল্ট' আন্দোলন সত্যিই কিছুকাল রুশকাব্যে প্রাধান্যলাভ করে। সব কিছুই সর্ব-হারাদের জন্যে এবং তাদের বোধগম্যভাবে প্রকাশ করতে হবে, এই ছিল এ 'কাল্ট' বা সংস্কৃতি-রচনার মূল কথা। কিন্তু সামাজিক অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে যেহেতু ইতিমধ্যে ধীরে চলার নীতি গৃহীত হয়ে শুরু হয়েছে 'নেপ' পর্ব, সেইহেতু কেবল-মাত্র সর্বহারাদের জন্যেই শিল্প-সাহিত্য রচনা করতে হবে এ বক্তব্য সমাজসমর্থন হারায় এবং ১৯২২-২৪-এর পর 'প্রোলেটকাল্ট' আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

এরপর ১৯৩২ সাল পর্যন্ত রুশ সাহিত্যে বিভিন্ন কাব্যধারা পাশাপাশি সহাবস্থান করতে থাকে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমর্থন ও আক্রমণে ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়। তখন ঐ ১৯৩২ সালেই গোর্কীর নেতৃত্বে স্থাপিত হয় সোভিয়েত লেখকসংঘ এবং 'সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা'কেই রুশ সাহিত্যের আচরণযোগ্য মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ মতাদর্শের তাৎপর্য হল এই যে, সাহিত্য হবে বিষয়বস্তুতে সমাজতন্ত্রী আর আঙ্গিকের দিক দিয়ে জাতীয়।

এ মতবাদ অনুসরণ করে গোর্কী, শলকভের মতো ঔপন্যাসিক যখন রুশ সাহিত্যে দেখা গেছে তখন এর সার্থকতার বিষয় প্রশ্ন তোলা যাবে না, কিন্তু বলতেই হবে এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় এবং সাহিত্যের নামে এতে বাজে লেখাও অনেক কাল ধরেই প্রশ্রয় পেয়েছে। মাঝখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর্বে দেশ-প্রেম

এবং উৎপীড়নের প্রতি ঘৃণা ও মানব-প্রীতির উপর কিছু ভালো কবিতা ও রিপোর্টাজ অবশ্যই লেখা হয়েছে। কিন্তু ১৯৪৬ সালে ঝানভের নির্দেশে 'সোভিয়েত লেখক সংঘ' সমাজতন্ত্রী বাস্তবতার যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করল তাতে চিন্তাহীন ইচ্ছাপূরণের পথই প্রশস্ত হল। ফলত, তার পরের প্রায় এক দশকের কবিতা দ্বন্দ্বহীন আত্মতুষ্টিতে এমনভাবে অতিসরলীকরণের দিকে ঝুঁকল যে তাকে 'পদ্য' ছাড়া আর কিছু বলতে দ্বিধা হবে।

যাই হোক, ১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যুর পর এ বিষয়ে দ্বিতীয় চিন্তার সুযোগ দেখা দিল ; এবং শলকভ প্রমুখের তীব্র মন্তব্যের ফলে ১৯৫৬ সালে পূর্বোক্ত 'ঝানভী' একরোখা নীতি পরিবর্তিত হয়ে সমাজতন্ত্রী বাস্তবতার নতুন ব্যাখ্যা গৃহীত হল। এতে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রকৃত সমাজ-পরিস্থিতির ভিত্তিতে দ্বন্দ্বমূলক-ভাবে বাস্তব প্রতিফলনের কথা বলা হল এবং কবিতার বেলায় কবির নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও আবেগের পরোক্ষতার কথাও স্বীকৃত হল। (অবশ্য বলা বাহুল্য কবির ব্যক্তিগত আশা-নিরাশা যদি সমাজতন্ত্র গঠনেরই বিপক্ষে যায় তবে সে স্বাধীনতা হবে স্বৈরাচার এবং তা কিছুতেই স্বীকার করবে না সোভিয়েত লেখক সংঘ।)

এভাবে বরফ গলার যুগ শুরু হবার পর রুশ কবিতায় পাওয়া গেছে অতি তরুণ একদল কবির কবিতা, যাঁদের মধ্যে ইয়েভতুশেঙ্কো (১৯৩৩) এবং ভোঝনেসেনস্কি (১৯৩৩) বলতে গেলে এখন প্রায় বিশ্বখ্যাত। তা ছাড়া ঈষৎ প্রবীণতর রোঝ্‌দেস্ত্‌ভেন্‌স্কি (১৯২৫) এবং তরুণতর লেখিকা আখমাদুলিনার (১৯৩৭) কবিতাও রীতিমত উল্লেখযোগ্য।

২

এ সংকলনে রুশ-বিপ্লবের সমকালে এবং তার পর থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছরে যে-সব কবি কাব্য রচনা করেছেন তাঁদেরই কবিতা সংকলিত হয়েছে। আমি রুশ ভাষা জানি নে বলে ইংরেজী অনুবাদ থেকেই কাজ করতে হয়েছে আমাকে, এবং এ ব্যাপারে নির্ভর করেছি সোভিয়েত লিটারেচারের বিশেষ কাব্য-সংকলনটির ('রাশিয়ান পোয়েট্‌স', ১৯১৭-৬৭) উপর। তার কারণ এই যে, অনুবাদের ফলে মূল কবিতার সৌন্দর্য কিছু পরিমাণে নষ্ট হবার সম্ভাবনা ; অপটু অনুবাদকের হাতে তার সর্বনাশ ঘটাও বিচিত্র নয়। কাজেই রুশ সম্পাদকের দ্বারা নির্বাচিত অনুবাদকেই এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা মূলানুযায়ী মনে করা আমার পক্ষে নিরাপদ

বলে মনে করেছি। হয়তো এর ফলে বর্তমান সংকলনের বাইরেও অনেক ভালো কবি বাদ পড়ে থাকবেন এবং এমনও হতে পারে যে গৃহীত কবিদেরও সর্বোত্তম কবিতা এখানে পাওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু সে ব্যাপারে আমি নিরুপায়।

তবে রাশিয়া থেকে প্রকাশিত সংকলনে যে-সব কবি ও কবিতাকে পাওয়া গেছে, তাদের সকল কবিকে বা গৃহীত কবির সেরা কবিতাটিও হয়তো সব সময় বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয় নি। বিপ্লবের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের জন্য ৫০টি কবিতার সংকলন প্রকাশ করা হবে এই পরিকল্পনা এবং আমার ব্যক্তিগত অক্ষমতাই সেজন্যে দায়ী মনে করে পাঠকগণ ক্ষমা করবেন।

অবশ্য সে অক্ষমতার একটি অন্য কারণও ছিল, তা উল্লেখ করা দরকার। ইতিপূর্বে আমরা রুশ কবিতার অনেক ইংরেজী অনুবাদ দেখেছি যা গদ্য-কবিতায় আকার পেয়েছে। কিন্তু 'রাশিয়ান পোয়েট্‌স' সংকলনের ভূমিকায় জানতে পেরেছি রুশ কবিরা প্রধানত গদ্যকবিতা পছন্দ করেন না, ছন্দ আর মিল দেওয়া কবিতাই লিখে থাকেন তাঁরা। এবং আলোচ্য সংকলনে গৃহীত কবিতাবলীও সেই ছন্দ-মিলের রীতিতেই অনূদিত হয়েছে দেখা গেল। ফলে আমাকেও ছন্দমিলেই বঙ্গানুবাদের জন্য সচেষ্ট হতে হয়। আর কাজটা যে খুব সহজ নয় তা আশা করি অনেকেই স্বীকার করবেন। বিশেষ করে আমার লক্ষ্য ছিল, রুশ ভাষা না জানি, ইংরেজী অনুবাদ থেকে অন্তত একেবারেই সরে না যাওয়া। কাজেই সব সময় পছন্দসই কবিতা হয়তো অনুবাদ করে উঠতে পারি নি।

যাই হোক, সংকলিত কবিতাগুলি অনুবাদ করতে গিয়ে আমি বা লক্ষ্য করেছি তাই এবার সংক্ষেপে নিবেদন করি।

প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হল— বিপ্লবোত্তর রুশ কবিদের আত্মবিশ্বাস, মুক্তির আনন্দ এবং অপরিসীম দেশপ্রীতি ও মানবপ্রেম। এঁদের রচনাভঙ্গি সরল, কিন্তু তার কারণ খুবই স্পষ্ট— যাতে মোটামুটি সকলের কাছেই এ-সব কবিতার আবেদন পৌঁছয় সেইটেই ছিল কবিদের লক্ষ্য।

এর পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেল দেশ গঠনের জন্যে নির্মাণ-কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে আগ্রহ, ভ্রাতৃত্ববোধ, সর্বব্যাপারে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি।

এইসঙ্গেই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর্বে রুশ কবিতায় লক্ষ্য করা গেল ফ্যাসিজ্‌ম ও অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা এবং দেশের মাটি-জল-আকাশ ও মানবজীবনের প্রতি সুগভীর মমতাবোধ। ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতাও এ সময়ে একটা নতুন সামাজিক

নিহিতার্থে সজীব হয়ে উঠল। আর যুদ্ধোত্তর কালে এই সমাজদৃষ্টির ফলেই দেখা যেতে লাগল সারা পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষদের জন্যে বেদনাবোধ এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি।

একেবারে গত দশ বছরের রুশ কবিতায় বিদেশের সঙ্গে স্বচ্ছন্দতর যোগাযোগের ফলে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান মহাকাশ যুগের অবতারণার ফলে চিন্তাজগতের ভাববিস্ফোরণ এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির সর্বব্যাপী প্রসারের ফলে কবি-সাহিত্যিকদের সামাজিক দায়িত্বের বিষয়ে গভীরতর সচেতনতা— এই-সব মিলিয়ে রীতিমত একটা গুণগত পরিবর্তনই ঘটে গেছে বলতে হবে। রুশ কবিতার নিজস্ব ঐতিহ্য এবং অন্যান্য দেশের আধুনিক কবিতার মধ্যে যা-কিছু গ্রহণীয় সদ্‌গুণ আছে সেইগুলি ব্যবহার করেই একালের রুশ সাহিত্যে নতুন ধরনের 'আধুনিকতা'র সূত্রপাত হয়েছে। আর মূলত এই 'আধুনিকতা' আমাদের পরিচিত ইউরোপীয় 'আধুনিকতা'র থেকে ভিন্ন জাতের। ইয়োরোপীয় আধুনিকতার উৎস হল সামাজিক 'বিচ্ছিন্নতা' বা এলিয়েনেশান। আর রুশ আধুনিকতার অন্তঃসার হল সামাজিক সংযোগের বিষয়ে নিশ্চিতি এবং সেই কারণে স্বাচ্ছন্দ্য ও উল্লাস। সত্যি বলতে কি, ইয়েভতুশেঙ্কো, ভোঝনেসেনস্কি বা বেলা আখমাদুলিনার কবিতায় যে নতুন মূল্যবোধের স্ফূর্তি দেখা যায় তা যে-কোনো সহৃদয় পাঠকেরই নতুন অভিজ্ঞতা বলে মনে হবে। আমি অন্তত, বর্তমান সংকলনে অনূদিত আখমাদুলিনার কবিতাটি পড়ে মুগ্ধ না হয়ে পারি নি। যে-কোনো বিচারেই একে একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা বলতে আমি বাধ্য, এবং আমার বিশেষ করে অবাক লেগেছে যন্ত্র এবং মানুষকে তিনি কত সহজে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বেঁধে রসোত্তীর্ণ করতে পেরেছেন। আর তা করতে গিয়ে কবিতার রূপকল্প এবং আঙ্গিকেও এতটুকু ঢিলেমিকে প্রশ্রয় দিতে হয় নি।

আমার স্থির বিশ্বাস, আখমাদুলিনার এই সাফল্য এ যুগের রুশ কবিতায় কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং সে দেশে আধুনিক কবিতার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে।

পরিশেষে জানাই, অনুবাদের গুণাগুণ যাই হোক, 'মনীষা'র কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীগণ স্বল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত যত্ন করে এই সংকলনটি প্রকাশ করে রুশ-ভারত মৈত্রীতে যে নতুন একটি সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সেতু রচনা করলেন সেজন্যে তাঁরা বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতা অর্জন করবেন।

মণীন্দ্র রায়

সূচীপত্র

নতুন দিনের রুশ কবিতা

ভালেরি ব্রাইয়ুসভ
১৮৭৩-১৯২৪

লে নি ন

কে ছিলেন তিনি ? সারা পৃথিবীরই নায়কপুরুষ তিনি,
তিনি যে দিশারী সব মানুষেরই স্বাধীন আকাঙ্ক্ষার,
লোকের বরাত বদ্‌লান, আর বিবিধ স্রোতস্বিনী
নানা এলোমেলো পথ থেকে টেনে নদী দেন একতার।

অক্টোবরেই শুরু হয়েছিল নতুন যুগের পর্ব।
কালান্তরের এই সীমারেখা তারো চেয়ে সুগভীর,
যেমন দিয়েছে রেনেসাঁস আর অ্যাটিলার মহাগর্ব,
অথবা যা-কিছু মেলে ইতিহাসে সমস্ত পৃথিবীর,

পুরনো দুনিয়া টাল খায়, সে যে ভঙ্গুর, ধ্বসে পড়ে,
নতুন জগৎ— সবার সুখের বিধান এনেছে যেদিন—
অক্টোবরের ঝড় থেকে দেখো তারই ভিত ক্রমে গড়ে,
গত আর নয়া দুনিয়া সীমায় উন্নতশির লেনিন।

পৃথিবী, তুমি তো মহাজগতের অসীম পাথারে ভেসে
কত কোটি কোটি গ্রহতারা ভিড়ে হারিয়ে রয়েছ কোথায়,
ঐ পথ দেখো জড়াবে তোমায় জ্যোতিমহিমার বেশে,
তার তুলনীয় পাও নি কখনো কোনো গৌরব-গাথায়।

তিনি মৃত ; তাঁর জীবন তো ছিল অনন্ত মহাকালে
এক নিমেষেরই মতো, তবুও যে কৃতি তাঁর অম্লান
মৃত্যু পেরিয়ে অমর। এবং অন্ধকারের জালে
তাঁরই ভবিষ্যৎবাণীর শিখা যে দিশারী অনির্বাণ।

আলেকজান্দার ব্লক
১৮৮০-১৯২১

সিদিয়াবাসী

তোমরা কত লক্ষ, তবু, আমরা আসছি বন্যাবেগে,
তোমরা এ তোড় বাঁধবে নাকি ? ভাবো বরং ঠাণ্ডা মাথায়।
সিদিয়াবাসী[১] আমরা, জেনো, এশিয়া আছে রক্তে জেগে,
এবং দেখো, খিদের চাপে নজর বাঁকা কী উগ্রতায় !

তোমরা চলো শতক মেপে, আমরা একটি ঘণ্টা কেবল।
ক্রীতদাসের মতোই আমরা, বশংবদ ও ঘৃণ্য বুঝি !
আমরা রুখি, ওৎপাতা আর পাথর ঘেরা পাহাড়ী দল,
তোমাদের ও' য়ুরোপ থেকে মঙ্গোলদের সোজাসুজি।

কত শতক হাতুড়ি-পেটা কামারশালা রাখল ঢেকে
চিড়-ধরা এক বরফের চাঁই, খসে পড়তেই যা উদ্যত ;
আর লিসবন এবং পরে মেসিনা[২]ও-যে গেল ডেকে,
শুনলে সেটা অবাক এবং আজগুবি রূপকথার মতো।

কত শতক পুবের দিকেই স্বপ্নগুলো রাখলে জ্বেলে,
আমাদের যা মণিমুক্তো ছিনিয়ে, লুঠের মাল সরালে।
আবার দেখো কী পরিহাস, ঘিরে রাখলে কামান ঠেলে ;
রইলে, কখন গোলা ছুঁড়বে সেই ইশারার সুযোগ-তালে।

সেই সময়টা এলো এখন, ধ্বংস বুঝি মেলছে পাখা।
অপমানও বেজায় ভারী, আমরা ভুরু কুঁচকে দাঁড়াই।
বেজে উঠলে ঘণ্টা, আমরা ঘিরব যেন অগ্নি-চাকা,
লুটিয়ে ফেলব মাটিতে ঐ 'পিস্টামে'র বাঁজা বড়াই।

দাঁড়াও তবে, প্রাচীন জগৎ, নয়তো ডুববে শেষ ভরসাও।
বিজ্ঞ, ক্লান্ত, ফতুর, দেখো, নিয়তি আজ সম্মুখে ঐ।
প্রাচীন 'ইডিপাস'[৩], 'স্ফিংসে'র[৪] মুখোমুখি সোজা দাঁড়াও
তার চোখের যা কালো ধাঁধা— ব্যাখ্যা ক'রে হও না জয়ী।

সে স্ফিংস তো রাশিয়া ; জয়ে দুর্মদ, তাও নিপীড়িত ;
রক্ত-ঘামের পরিশ্রমে চায় সে ন্যায্য নিয়তিকে।
দু চোখ যেন পাথর-গড়া, পশ্চিমেই নজর স্থিত ;
তোমাকে কে প্রণয় জানায়, ঘৃণাও ছোঁড়ে তোমার দিকে।

ভালোবাসার সঞ্চয় যে উজাড় করলে অনেক আগেই,
সেই প্রেম যা উল্লাসের যন্ত্রণায় সব কেড়ে নেয়।
আমাদের সে দুরন্ত প্রেম আজ তোমাদের মনেও তো নেই,
সে প্রেম বুঝি জ্বালায় এবং জ্বলতে জ্বলতে শেষ করে দেয়।

ভালোবাসি সকল কিছু। স্নিগ্ধ গানের উন্মাদনা,
দৃশ্যপটের আলেখ্য যা তুলির টানে সুচিত্রিত।
সব কিছুই জানি, ফরাসী রসিকতার দীপ্তকণা,
জার্মানদের প্রদোষ, যাতে নতুন চিন্তাজগৎ ধৃত।

সব কিছুই মনে রয়েছে— মঁমার্ত্রে'র[৫] 'হেল্' হোটেল ;
ভেনিসের সে সাগর-হাওয়া টাটকা-তাজা কেমন বয়,
কোন সুদূরের কম্‌লাবনের মুকুলগন্ধে সে উদ্‌বেল ;
কলোন শহর কেমন উঁচু প্রাসাদপুরীর পাষাণময়।

এবং ভালোবাসি শরীর, তার স্বাদ, তার বর্ণ আভা,
তার কাঁচা আর নশ্বর ঘ্রাণ টানছে কাছে বারেবারে,
দোষ হবে কি, আমাদের এই ভারী এবং শান্ত থাবা
যদি ধরায় চিড় কোনোদিন তোমাদের ও' দেহের হাড়ে।

আমরা ধরি বন্য ঘোড়া, দেহশক্তির বড়াই করি
কাঁপায় তারা, লাফায় তারা, ঝাঁকুনি দেয়, সবই বৃথা
অস্থির সেই চোয়াল শেষে নেয় আমাদের লাগাম দড়ি,
ক্রীতদাসীও পোষ মানে, তার বাঁকানো ঘাড় করি সিধা।

কাজেই ছাড়ো যুদ্ধের ঐ ঘোর কালিমার বাঁকা সড়ক।
নাও আমাদের শান্তি-খোঁজা হাত দু হাতে, বৃথাই দেরি!
পুরনো ঐ কৃপাণ খাপে ভরো, সন্ধি বহাল হোক,
ভাইয়ে ভাইয়ে মিল ঘটে আজ ভাঙুক ঘৃণার অন্ধ বেড়ি।

আর যদি এ' না হয়, আমরা প্রতারণার ছল চিনি খুব,
তাতে অবশ্য সামনে আমরা দেখব নাকো তেমন অথৈ।
কিন্তু তাতে পশ্চিমেই দেখবে ধ্বংস-শতক স্তূপ
তোমাদেরই পুত্রকন্যা— অবল, উজাড়— দূষবে স্বতই।

বাইরে পালিশ-মুখ তোমাদের, য়ুরোপ, আমরা আনব টেনে,
অন্তবিহীন প্রান্তরে আর বনের মধ্যে পথ ভুলিয়ে,
আনব গুল্ম-ভরা সাগরে, এবং পাল্টা আঘাত হেনে
ঝাঁপিয়ে পড়ব, দেখবে তখন এশিয়াবাসীর মুখটা কী এ!

তবে উরাল[৬] চূড়ায় এসো, পরিষ্কার ও চওড়া তারা,
এবং ছোটো কালো গহন গিরিখাদের ভিতর দিয়ে,
হৃদয়হীন বিজ্ঞানের সঙ্গে লড়ুক আদিম যারা;
মঙ্গোলীয়ের সামনে দাঁড়াও নীরেট যন্ত্রসজ্জা নিয়ে।

তখন কিন্তু আমরা সোজা ধরব নাকো হাতের ঢাল,
পার্শ্বরক্ষা করব না আর তোমাদের সে চরম ক্ষণে
দেখব শুধু রক্তপাতে মুখর মাঠের সেই আকাশ;
আমাদের তো দয়া কিছু নেই, দেখব কেবল আড় নয়নে।

নৃশংস ঐ হূনের হাতে কাটা মুণ্ডে জমবে পাহাড়,
তোমাদের ও' শহরগুলো পুড়িয়ে তারা ওড়াবে ছাই,
গির্জাগুলো করবে তারা ঘোড়ার আস্তাবল, চারিধার
শাদা চামড়ার পোড়া গন্ধে কোনোখানেই স্বস্তি নাই।

প্রাচীন জগৎ, কর্মে আর শান্তিতে সব শুভ যেখানে
সেইখানে সে সুখী দিন ও রাতের দিকে ডাকছি আজ।
ভাইয়ে ভাইয়ে মেলার খুশি ভ্রাতৃত্বের প্রবল টানে
এই শেষবার বর্বরের বাঁশি ডাকছে, শোনো, দরাজ॥

দেমিয়ান বেদনি
১৮৮৩-১৯৪৫

উপসংহার

'মেইন স্ট্রীট' বা বড়ো রাস্তা কবিতার শেষাংশ

ইতিহাস মোড় নিয়ে বেঁকে যায়, বুনে যায় জাল···
প্রহরীঘণ্টার ধ্বনি বাজে, কী সে জানায় উত্তাল ?
কঠিন সংগ্রাম বহু বছরের, নেই খ্যাতিশোভা—
এই তো বিজয়মাল্য, আমাদের জয়ের শিরোপা।

ভাই হে, বিশ্বাস মোটে কোরো না এ ফাঁকা তোষামোদে :
"তোমরা বিজয়ী ! তাই বশ্যতার জানাই শপথ।"
এবং দিও না কান ভীরুদের এ প্রশ্নের স্রোতে :
"আরো কত বোঝা টেনে বইতে হবে দুঃখের পর্বত ?"

হতে পারে, শত্রুদের বিশ্ব-রাজপথের নিরিখে,
আমাদের রাস্তা যেন গলি এক পিছনের দিকে।
তবু ঐ সৌধগুলি নয় জেনো রূপৈশ্বর্য মাখা,
ধাপ্পার ভুতুড়ে হাতে রঙ ক'রে ঠেকো দিয়ে রাখা।

যখন ও 'বড়ো রাস্তা' আক্রমণ করেছি প্রথম
তখন তাড়িত আমরা খুঁজি নি কি গলি-উপগলি ?
তবুও শত্রুর চেয়ে শক্তিতে ছিলাম বটে কম,
রুখি নি কি বারেবারে দল বেঁধে, নিরন্ত, কেবল ?

এ লাল জোটের সীমা সারা বিশ্বে রয়েছে স্বরূপে,
যদিও অসম পথে, বিক্ষত, সে নয় সংখ্যাগুরু !
তবুও হতাশ কেন, বড়ো ধাক্কা নিয়েছি তো লুফে ?
শক্তিকে সংহত করা আজ তবে হবে নাকি শুরু ?

দাঁড়াও, যা-কিছু দুঃখে অর্জিত তা আগলাও এবার,
কালের ঝেঁটানো হাত লক্ষ্য করো আজ অপলক ;
শোনো সমতল থেকে প্রতিধ্বনি—সানন্দ চিৎকার ;
দুঃসাহসী কণ্ঠস্বরে ওরা জেনো নতুন যুবক।

ভাই হে, দেখো না ঐ আলোগুলি জলে কী ভাস্বর !
শোনো না, দূরের ঐ শিবিরের শব্দ কী রকম।
ওরা তো নতুন সৈন্য, যুদ্ধে এরা সতেজ, প্রখর।

সামনে-সামনে-সামনে চলো, সামনে-সামনে জোরকদম।
সামনে-সামনে-সামনে চলো, সামনে-সামনে জোরকদম।

ওরা আসছে, ওরা আসছে, ওরা আসছে, ওরা আসছে,
লোহার আংটা, লোহার শিকল জুড়ে, কী শব্দ ভাসছে,

ঐ তো দ্রুত আসছে ওরা ভয়াল পদশব্দে
ভয়াল পদশব্দে
আসছে,
ওরা আসছে,
বিশ্বজয়ের শেষঘাঁটি আজ সম্মুখে, শেষ অব্দে !

আনা আখমাতোভা

১৮৮৮-১৯৬৬

আরো অনেক জিনিস আছে

আরো অনেক জিনিস আছে চাইছে যারা
আমার মুখে তাদের যশের বন্দনা-গান—
উঠে আসছে, চেঁচাচ্ছে সব, যাদের পাড়া
মাটির নীচের গুহায়, তারা তুলছে সাড়া,
চাইছে—তাদের আবেগ যেন করি রূপদান।

আরো অনেক কথা আমিও বলতে চাই
আগুন কিংবা জলের নামে, মাটি বাতাসে।
তাই তো যখন কল্পনায় মন ছোটাই,
তোরণ খোলে, আমিও গতির ঝড় ওঠাই
শুকতারাকে ছাড়িয়ে সিঁড়ির নীলোদ্ভাসে॥

রাশিয়ার মাটি

সৌন্দর্যের মালা করে একে আমরা পরি না কখনো,
এর দুঃখে কবিতায় কখনো করি না অশ্রুপাত,
স্বর্গের নন্দনে এর খুঁজি নাকো তুলনীয় কোনো,
ঘুমে উপপ্লব এনে মর্মে এ'তো ঢালে না বিষাদ।
একে বিক্রি করা, যার অনুমাত্র বিষম ভাবনা
এমন কি মনেরও দূর অজানায় বাঁধে না শিকড়।
দু চোখে প্রতিমা এর সেদিনেও করি না স্থাপনা
যখন দরিদ্র, রুগ্ণ, হতাশ্বাসে ভাষাহীন, জড়।

জুতোর উপরে এ তো কাদা, এ তো কাঁকর দু পায়ে
দাঁতের উপরে এ তো বালি, এ তো পাকের উৎসার ;

এ যে শুদ্ধ অকলঙ্ক ধুলো আমরা চলেছি মাড়ায়ে,
ভাঙি ও মেশাই একে, গুঁড়ো করি একে বারংবার।

তবু আমাদেরই এ যে, কী আপন, তাই স্থান দিতে
একদা হৃদয় খুলে কাছে টানবে, মেশাবে মাটিতে ॥

বোরিস পাস্তেরনাক
১৮৯০-১৯৬০

সৃষ্টিকর্মের সূত্র

গায়ে বুক-খোলা সার্ট বিস্ফারিত রয়েছে আসীন,
চুল যেন বেঠোফেন-মূর্তির ঝাঁকড়া কেশ, জোরে
দাবারু-র মতো তার উল্টানো তালুতে আছে লীন
স্বপ্ন ও বিবেক, আর ভালোবাসা, দীর্ঘ রাত্রি ধরে।

জনৈক আবলুশ কাঠে তৈরি রাজা ক্রোধের দাপটে,
দুঃখিত অন্তর, তবু মহাধ্বংস চায় এনে দিতে
সারা বিশ্ব জুড়ে, আর ঘোড়াগুলি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে—
খুরের আঘাতে তাই বোড়ে-গুলো লুটোয় মাটিতে।

বাগানে, বরফ-ঢাকা নিহিত পাতালঘর থেকে
'স্টার' ঘাস শষ্পগন্ধে মাথা তোলে দেখি পুনর্বার,
(আইসোল্ড[১]-এর দ্রাক্ষাকুঞ্জে নাইটিঙ্গেল উঠেছে যে ডেকে !)
উপশম ঘটে বুঝি ট্রিস্টানেরও শীতার্ত ব্যথার।

ঝিল ও উদ্যান আর বেড়াগুলি, যে যার নিয়মে
উদ্‌বেলিত হয় শাদা অশ্রুতে, সমগ্র এই পটে
যত কিছু বস্তু সবই আবেগের রূপ ধরে জমে—
একান্ত গচ্ছিত তারা মানুষেরই মর্মের নিকটে।

সব কিছুর মধ্যে আমি

সবকিছুর মধ্যে আমি ধরতে চাই
একেবারেই মৌল ব্যাপার :
প্রতিদিনের পছন্দ, বা কাজ যেটাই,
তাতেও খুঁজি মর্মদুয়ার ;

অতীতের যা সার সেটুকুই চাই টানতে
প্রথম ভিত্তি বলছি যাকে,
জটপাকানো শিকড়, যেটা হৃদ্‌প্রান্তে,
জানতে চাই সে ব্যাখ্যাটাকে ;

এবং ভাগ্য-ধাঁধার সুতোর মুখটি খুঁজে,
সব ঘটনার নিরীক্ষণে
বাঁচতে ভালোবাসতে ধ্যানের চক্ষু বুজে
আবিষ্কারও চাই জীবনে।

আহা, আমার শক্তি যদি যথেষ্ট, আর
চলতি রীতির পরেও টেকে,
হৃদয়বৃত্তি-ব্যবচ্ছেদে স্বরূপটা তার
আট লাইনেই যাব দেখে।

লিখব আমি পাপের কথা, নিষিদ্ধ ফল,
আকস্মিকের ছায়ার ছবি ;
পলায়নের পিছেই অনুসরণ সফল ;
হাত ও কনুই, লিখব সবই।

সূত্রগুলির বর্ণনা ও উৎস যত
লিখে রাখব বিচার করে,
বারেবারেই বলব— যে নাম বলার মতো,
সইগুলি তার রাখব ধরে।

দারুণ খেটে কাব্যে আমার আনব আদল
যেন বাগান যত্নে-গড়া :
গ্রীবার কাছে ফুটবে লাইম-মঞ্জরীদল,
পাঁচিল দুটি প্রান্তে-ধরা।

কাব্যে দেব ছাঁটা-বেড়ার গাছের ঘ্রাণ,
গোলাপ এবং তৃণপ্রান্তর,
পুদিনা, সেজ্, নতুন-কাটা খড়ের দান,
আর বজ্রের সে ঘর্ঘর।

যেমনটা ঠিক শোপাঁ বারেক তাঁর বাজনায়
মিশিয়েছিলেন ইন্দ্রজালে—
বাগান, কুঞ্জ, কবর এবং সে স্তব্ধতায়,
অবাক কাণ্ড চলতি কালে।

পেয়ে যাবার লগ্ন ধরব শক্ত মুঠেই
খেলা-ব্যথার জোড়ের মুখে···
আল্‌গা গানের ছিলা হঠাৎ কেঁপে উঠেই
টংকারে টান বাঁকা ধনুকে॥

মারিনা ৎস্‌ভেতায়েভা
১৮৯২-১৯৪১

ঈর্ষাবোধের চেষ্টায়

কেমন চলছে জীবন এখন আরেকজনের সঙ্গে—
সহজ তবে ?— একটিবার দাঁড় ফেলেছ, আর
বন্দরের তটরেখার মতোই কি বিভঙ্গে
মিলিয়ে গেছে আমার স্মৃতি, চিহ্ন নেই তার ?—

কিংবা যেন দ্বীপ থেকে দূর দ্বীপেই ওড়া মাছি ?
(সমুদ্রে নয়, সে দ্বীপ যেন আকাশলোকে গড়া !)
আত্মা, আহা, আত্মা ! বোন ও ভাই সে কাছাকাছি,
প্রেমের রাজ্য প্রেমিক তারা হয় না স্বয়ংবরা !

কেমন চলছে জীবনটি তার সঙ্গে, সে কি সরল
মেয়েই শুধু ? কোনো কিছুই মাধুর্য তার নেই ?
রানী তো আজ ত্যাগ করেছে মন্দিরের মহল,
তুমি তোমার সিংহাসন, তার দেউল সে তো সে-ই !

তা হলে আজ জীবন কেমন ? চোরা দ্বিমত নিত্য ?
রোগা হচ্ছ ? কষ্ট হয় কি চলতে গেলেও এখন ?
চিরদিনের জমে-ওঠা চলতি কাজের বৃত্ত—
ভিক্ষুক হে, দামটা কি তার মিটিয়ে দিচ্ছ তেমন ?

"উত্তেজনা এমন, খিটিমিটি এবং ভাবনা—
অন্য বাড়ি ভাড়া করব। শেষ হয়েছে, হোক !"
কেমন চলছে জীবন এখন, যে কেউ সঙ্গে থাক না,
তুমি আমার আপন, আমার নির্বাচিত লোক !

পাচ্ছ তোমার পছন্দসই আনন্দকর খাদ্য ?
একঘেয়ে তা লাগবে যখন, কেঁদো না তাই নিয়ে !

কেমন চলছে জীবন, সঙ্গে সোনার পুতুল, বাধ্য ;···
তুমি-না সেই লোক, যে সিনাই[৮] পাহাড় গেছে ডিঙিয়ে ?

কেমন চলছে জীবন এখন অন্য মেয়ের সঙ্গে
নশ্বরী সে ? সত্যি বলো— কিংবা এটা প্রণয় ?
লজ্জা কি আজ জিউস[৯] হয়ে তোমার ও ভ্রূভঙ্গে
বাজ ছোঁড়ে না, ধিক্কারে কি লেলিয়ে দেয় না প্রলয় ?

কেমন চলছে জীবন এখন— হচ্ছে কি পছন্দ ?
ভালো লাগছে ? গান গাও কি ? গাইতে পারো আজো ?
অবিনশ্বর বিবেক আজো ফোটায় কাঁটার রন্ধ্র,
হায় বেচারি, কী করে তা সামলে নিয়ে আছ ?

কেমন চলছে জীবন এখন মেলা-সাজানো ঐ
রঙিন শিকলি নিয়ে ? সে কি বেগার খাটা— এমন ?
শ্বেত 'কারারা' মর্মরে যে ছিল মূর্তিময়ী
তার পরে ঐ প্ল্যাস্টারের কাজ লাগছে কেমন !

(গোটা পাথর থেকে কোঁদা প্রতিমা সেই দেবীর
শতখণ্ডে ভেঙে এখন লুটোয় মাটির প্রান্তে !)
কেমন লাগছে সঙ্গ এমন অশিক্ষিতা সে স্ত্রীর,
লিলিথ[১০] নামে পরম নারীর ঠোঁট অথচ জানতে !

হাটের থেকে কেনা খেলনা জোগাড় করে তারপর
শখ মিটেছে ? এখন তুমি খুঁজছ বুঝি— জাদু ?
কেমন চলছে জীবন ? তোমার ঘরনী তো নশ্বর,
ষষ্ঠ নামক ইন্দ্রিয়ে তার সঙ্গ তো নয় স্বাদু ?

বুকের 'পরে হাত রেখে কও, তার সঙ্গেই সুখী ?
নয় ? এটা কি ব্যর্থ— শুধুই চলছ খেয়াল-রঙ্গে ?
কেমন চলছে জীবন, প্রিয় ? দুঃখদিনের ঝুঁকি ?
কিংবা আমার কাটছে যেমন নতুন বরের সঙ্গে ?

ভ্লাদিমির মায়াকোভ্স্কি
১৮৯৩-১৯৩০

কুঝ্নেৎস্কস্ট্রোই এবং তার রাজমিস্ত্রিদের এক কাহিনী

১০০০০০০ ওয়াগন বাড়ি-তৈরির মালমশলা আনা হবে এখানে। এক বিরাট ইস্পাত কারখানা, মস্ত মস্ত কয়লাকুঠি এবং শতসহস্র মানুষের বাসস্থান এক শহর তৈরি হবে এখানে পাঁচ বছরের মধ্যেই।...(সংলাপ)

মেঘগুলো সব ছুটে চলেছে
        আকাশ-পথে।
বৃষ্টি যেন
        হৃদ্‌পিণ্ড ধরে মুঠোয়।
খিলধরা এই ভেজার মধ্যে
        শ্রমিকেরা রাত জিরোতে
পুরনো এক গাড়ির নীচে কেমন শোয়।
যদিও সবই আমূল সিক্ত
        কাছে ও দূরে,
বলছে তারা নিম্ন স্বরে
        কষ্ট করে,
"হবে এখানে
        বাগান-ঘেরা শহর একটা
এখন থেকে
        ঠিক চারটি বছর পরে।"
দড়ির মতো মোটা মোটা
        বৃষ্টি যেন
                চাবুক হয়ে নামছে নীচে।
সীসের মতো রাত্রি কালির মতো পুরোটা।
চতুর্দিকে কাদা এবং শ্রমিকদের
        কাপড় থেকে জল ঝরছে, এতই ভিজে!
চোরা লণ্ঠন মিটমিটে চোখ
        তার আলোটা।

শ্রমিকদের ঠোঁটগুলি যে
ঠাণ্ডা জমে প্লাম ফলের মতোই নীল,
কিন্তু নিচু কণ্ঠে তবু বলছে সবাই :
"বাগান-ঘেরা শহর জেনো হবেই, সেটা
হবে হাসিল্।
ভাই রে, এতে সন্দেহ নাই!"
ভেজা মাটির ভেতর থেকে
গরম ঝোলের মতোই ধোঁয়া উঠছে এখন;
কিন্তু তাতে সান্ত্বনা কই
জব্জবে এই আবহাওয়াতে।
আধো অন্ধকারের ভেতর
শ্রমিকেরা করে চর্বন
রুটির মতোই বস্তু কিছু
মিলেছে যা তাদের হাতে।
তবুও স্থির
নিচু স্বরের কথা ওদের আসবে কানে,
বৃষ্টিফোঁটা পড়ে যদিও
এখন বেজায় শব্দ করে,—
"বাগান-ঘেরা শহর একটা হবে এখানে
আলোয় ঘেরা,
ফুল সাজানো
এবং সবই, ফর্দ করে।
ডিনামাইটে শব্দ তুলে ফেটে চৌচির
'হুস্' ক'রে সব ভালুক যত
তাড়িয়ে দেবে অন্যখানে,
এবং দৈত্যদানোর মতো 'মাইন'গুলো
কয়লা-খোঁজার গর্ত করে
ছিঁড়ে ফেলবে এই পৃথিবীর অন্ত্রতন্ত্র
প্রবল টানে।
বিশাল উঁচু ফ্যাক্টরির পাঁচিলগুলো!

বাষ্পতেজে বাজবে তাদের জোর বাঁশি !
চুল্লিগুলো জ্বলবে যেন শতসূর্য—
আলোয় উঠবে সাইবেরিয়াও উদ্ভাসি'।
আমরা থাকব ভালো বাড়িতে
জেনো সকলে,
র‍্যাশন-খোলা রুটিও সবাই
খাব তখন,
এবং দূরে ছাড়িয়ে প্রাচীন
সে 'বৈকল্'[১১]-এ
ভয়ের চোটে সরবে জলার পাইন বন।"
শ্রমিকদের
নিচুগলার
শব্দ ক্রমে উঁচুর দিকে
ছাড়ায় মাথার উপর বাদলা মেঘের দল,
এবং 'বাগান-ঘেরা শহর'
কথা দুটিকে
বারেবারেই স্পষ্ট শোনা যায় কেবল।
সেই বাগান
উঠবে ফুটে ফুলের মতো,
তুলবে মাথা
সেই শহর
যখন সোভিয়েত রাশিয়ায়
মিলবে এমন মানুষদেরই আরো জোগান
দেখছি যেমন এক্ষুনি ঠিক চোখের উপর !

সারগেই এসেনিন
১৮৯৫-১৯২৫

কাল আমাকে জাগিয়ে দিয়ো

কাল আমাকে জাগিয়ে দিয়ো রাতের শেষে ভোরে,
মাগো আমার মা, তা হলেই চমৎকার সে হবে।
বেড়ার ঝোপ পেরিয়ে চলব সোজা পথটি ধরে,
প্রতীক্ষিত সেই অতিথির নাগাল পাব তবে।

আজকে আমি বনের পথে দেখে এলাম ঘুরে
চাকার দাগ সেই মাটিতে কেমন গভীর আঁকা।
বাতাস যেন, মেঘের নীচে, সারাটি পথ জুড়ে
ছুটিয়ে গেছে সোনালি রঙ 'ট্রোইকা'গাড়ি বাঁকা।

ভোরবেলা সে জাগবে এবং ছুটবে, রাখবে খুলে
চাঁদের টুপি ঝোপের নীচে বৃক্ষরাজির তলায় ;
মেয়ে ঘোড়া তার মাঠের বুকে ছুটবে, উঠবে দুলে
লাল রঙা সেই ল্যাজের ঝুঁটি সানন্দ তার চলায়।

কাজেই আমায় জাগিয়ে দিয়ো রাতের শেষে ভোরে।
ঘরের মধ্যে বাতিটা জেলে ডেকো আমায় তখন।
কারণ, সবাই বলছে, আমি লেখারই পথ ধরে
হবই নাকি রুশ কবি এক— সবার চেনার মতন।

গাইব আমি চুলা, মুর্গি এবং ছাদের কথাই,
তোমাকে আর অতিথিকেও জাগাব সেই গানে—
দুধ দেবে যা মাগো তোমার কপিলা-রঙ ও' গাই
ছড়াব তা কথায় আমার, ছন্দে ও সবখানে ॥

কাচালভ্-এর কুকুরকে

বরাত খুলবে, জিম একবার পা রাখো এই হাতে
এমন পদপল্লব আর দেখব কোথায় বলো!
চাঁদের লোভে একসঙ্গে চিল্লানো যাক চলো,
হাওয়া যখন শান্ত এবং ফর্সা, সে মৌতাতে।

না হে বুড়ো ধাড়ি, আমার হাত চেটো না আবার ;
সহজ কথা যেটা, আমায় বুঝতে হবে সেটাই ;
কিছুই তুমি জানো না তো জীবনটা কী ব্যাপার,
কিংবা আমি কী দাম দিয়ে মূল্যটা তার মেটাই।

কর্তা তোমার সদয় এবং বিখ্যাতও বটে—
দেখা করতে সর্বদাই লোক রয়েছে জমে ;
সবাই কেমন হাস্যমুখে তোমার সন্নিকটে
এগিয়ে হাত বোলায় নরম মখমল ঐ লোমে।

বড়োই মিষ্টি এবং দুষ্টু তোমার জাতের মধ্যে,
বিশ্বাসী আর সুন্দর— সব সদ্‌বংশেরই কপাল।
কারোই তুমি মত নেবে কি, পাও যদিবা ধরতে ?—
চুম্বনে সে নাকাল, তুমি বন্ধু যেন মাতাল!

জিম গো, তোমার অভ্যাগতের জানা লোকের ভিড়ে
কেউ সাধারণ এবং কেউবা সাধারণ্যে একা ;
একটি মেয়ে বিষণ্ণ ও শান্ত, সে মুখটিরে—
ঠিক জানি না— পেয়েছ কি ঐ বাড়িতে দেখা ?

যা হোক, যখন আসবে, সে ঠিক আসবেই তা জানি,
আমি সেখানে থাকব না, তার জন্যে কি আপসোস,
এগিয়ো তুমি তার কাছে, আর চেটো সে হাতখানি,
মাপ চেয়ো সব দোষের আমার ; সব ছিল না দোষ।

নিকোলাই তিখোনভ
১৮৯৬-

পেরেকের গান

পাইপে শেষ টান দিয়ে তিনি তাঁর আলগা হাসিকে
মুছে নিয়ে এগোলেন দলবদ্ধ নাবিকের দিকে।

"স্কোয়াড, অ্যাটেনশান! অফিসার, এগোও এখানে!"
এগোন কম্যাণ্ডার, দু পা সোজা তাঁর শিরা-টানে।

নাবিকেরা খাড়া হয়ে চুপচাপ থাকে প্রতীক্ষায়।
"যাবে ঠিক পুব-মুখো। নোঙর ওঠাবে আটটায়।

"ঘরে যদি বাচ্চা কিংবা বউ থাকে চিঠি লিখে দাও।
জীবনে ওদের সঙ্গে হয়তো আর হবে না দেখাও।

"তার পরিবর্তে পাবে চমৎকার খেলার সবুজ।"
"বটেই তো ক্যাপটেন!" বুড়ো মাল্লা দিল তার বুঝ।

যুবক এবং যারা ভয়হারা, চেয়ে রইল দূরে
যেখানে সমুদ্রজল পরিব্যাপ্ত উধাও রোদ্দুরে।

"কোথায়, তাতে কি?" জোরে কম্যাণ্ডার বললেন তখন,
"কোথায় আরাম এত, সমুদ্রের বিছানা যেমন!

"ভোরে অ্যাড্‌মিরাল তাঁর প্ল্যানের সংবাদে অবহিত:
লক্ষ্যস্থলে আসা গেছে, নাবিকেরা প্রত্যেকেই মৃত।"

নিশ্চিত, ওদের দিয়ে তৈরি হত পেরেক। এবং
কিছুতে হত না কোনো লোহা-কাঁটা শক্ত সে রকম।

নিকোলাই তিখোনভ
১৮৯৬-

পেরেকের গান

পাইপে শেষ টান দিয়ে তিনি তাঁর আলগা হাসিকে
মুছে নিয়ে এগোলেন দলবদ্ধ নাবিকের দিকে।

"স্কোয়াড, অ্যাটেনশান! অফিসার, এগোও এখানে!"
এগোন কম্যাণ্ডার, দু পা সোজা তাঁর শিরা-টানে।

নাবিকেরা খাড়া হয়ে চুপচাপ থাকে প্রতীক্ষায়।
"যাবে ঠিক পুব-মুখো। নোঙর ওঠাবে আটটায়।

"ঘরে যদি বাচ্চা কিংবা বউ থাকে চিঠি লিখে দাও।
জীবনে ওদের সঙ্গে হয়তো আর হবে না দেখাও।

"তার পরিবর্তে পাবে চমৎকার খেলার সবুজ।"
"বটেই তো ক্যাপটেন!" বুড়ো মাল্লা দিল তার বুঝ।

যুবক এবং যারা ভয়হারা, চেয়ে রইল দূরে
যেখানে সমুদ্রজল পরিব্যাপ্ত উধাও রোদ্দুরে।

"কোথায়, তাতে কি?" জোরে কম্যাণ্ডার বললেন তখন,
"কোথায় আরাম এত, সমুদ্রের বিছানা যেমন!

"ভোরে অ্যাড্‌মিরাল তাঁর প্ল্যানের সংবাদে অবহিত :
লক্ষ্যস্থলে আসা গেছে, নাবিকেরা প্রত্যেকেই মৃত।"

নিশ্চিত, ওদের দিয়ে তৈরি হত পেরেক। এবং
কিছুতে হত না কোনো লোহা-কাঁটা শক্ত সে রকম।

ভাসিলি কাজিন

১৮৯৮-

শ্রমিকের মে মাস

পাইপটাকে পাকড়ে ধরে সাঁড়াশি যেন রেঞ্চ আমার ;
আঘাত ঠুকে হাতুড়ি দেখো তুলছে আওয়াজ প্রতিধ্বনির ;
এবং আজ সকল বাড়ি ব্লকের পরে ব্লকের সার
জবাব দিচ্ছে একই জাতের শব্দ তুলে এ ঝন্‌ঝনির ।

ক্লিপারগুলো কাঁচির দাঁতে দেখো আমার হাতে কেমন
ধাতুর পাত ছোটো করছে, ছেঁটে ফেলছে বাড়তি যত ;
এবং দেখো নল থেকে ঐ বইছে জলের প্রস্রবণ,
ঘুরে পড়ছে অনাবশ্যক ফোঁটায় ফোঁটায় ইতস্ততঃ ।

একই রকম মেরামতির কাজ চলছে বাইরেও আজ,
বসন্ত যে আমাদেরও টুকরো-টাকরা ফেলছে ছুঁড়ে ।
বরফ গলা ঝিল কত যে এই মে-মাসে পেল স্বরাজ,
ঝকঝকে নীল, ঝলকে, যেন দস্তা তাদের বক্ষ জুড়ে ।

জানলাতলার চৌকাঠে ঐ দেখো কেমন উচ্চস্বরে
বৃষ্টি-ফোঁটা যেন হাতুড়ি পড়ছে ঝরে মহোল্লাসে,
হুল্লোড়ে আর প্রতিধ্বনির শব্দে কেমন বাইরে ঘরে
বালতিতে জল ঝরে পড়ছে চতুর্দিকে কী উল্লাসে !

আলেক্সি স্তরকভ
১৮৯৯-

ছোটো চুল্লিতে

ছোটো চুল্লির আগুন নাচায় জিহ্বা তার ;
পাইনকাঠের অশ্রু থেকে ঝরে রজন,
অ্যাকোর্ডিয়ান বাজাচ্ছে আজ বারংবার
তোমার হাসির গান, সুরেলা ঐ নয়ন।

তোমার নামই ঝোপঝাড়ে আজ মর্মরে,
মস্কো কাছে, বরফ-শাদা মাঠের মধ্যে,
জানাই : আছি, ভালোবাসছি মন ভরে ;
কিছুতে হার নয়, জানাচ্ছি এই সত্যে।

বরফ, বরফ ! শূন্য দৃশ্য সামনে উধাও।
দিনের সীমা ডিঙিয়ে সঙ্গ খুঁজছি মনে।
জানি, তোমার আমার মধ্যে দূরত্ব, তাও ;
এবং মৃত্যু চার-পা দূরে সঙ্গোপনে।

অ্যাকোর্ডিয়ান, গাও, ঝঞ্ঝা হোক অধীর ;
হারানো সুখ ফেরাও ঘরে ; যদিও ভিজে
যুদ্ধ-মাঠের গর্তে ঠাণ্ডা, প্রেমে নিবিড়
উষ্ণ তবু। ভালোবাসার কী শক্তি যে !

নিকোলাই উশাকভ
১৮৯৯-

রূপকর্ম

যখন আকৃতি ঐ আঙুলে নিশ্‌পিশ জাগে, আর
যখন ঝরনার মতো অভিজ্ঞতা বেগে প্রবাহিত
কুমোরের চাকা জুড়ে
তখন চালাও বিশ্ব ঘুরে ঘুরে
এইদিকে
এবং ওদিকে।
সংসার এখনো নয় পূর্ণরূপ, জানো,
যথাস্থানে হয় নি বসানো।
তাকে আজ পাদপীঠে বসাও এবং অনির্মিত,
মুখে তার দিনেরাতে দিতে থাকো চড়,
যতক্ষণে কাদামাটি জড়
কল্পরূপে না হয় বিধৃত।

স্তেপান শিপাচেভ

১৮৯৯-

প্রেমের কবিতা

মূর্খ লোকই প্রেমের মধ্যে শান্তি খোঁজে,
মোটেই সেটা নেই সেখানে।
দেখা পেলেও ভরসা তাতে রাখতে নেই—
যদিও হয়তো দেখতে পাবে প্রেমে এমন বান এলো যে,
মৃত্যুও তার পথ রুখতে ফিরল শেষে হার মেনেই।

কেউ কি ভালোবাসে তোমায়, নিয়েছ কি প্রেমের শপথ ?
দুটি যুক্তি করব তবে সমর্পণ :
অগোপন ও বিশ্বাসকে রেখো সেখানে স্থির জাতানত।
ওদের ছাড়া আসবে হয়তো ঘোর হতাশাই,
যেমন আমি মনেপ্রাণেই বুঝছি এখন।

বার্চ্ গাছ

ঝড় সে মেয়েকে ধরে তীব্র বলাৎকারে,
বাঁকায়, উলঙ্গ, তাকে খর বৃষ্টিপাতে।
মুচড়িয়ে সে আলগা হয়, চায় নির্বিকারে ;
সে দৃষ্টিতে ঝড়ো ইচ্ছা লুকায় তফাতে।

আবার শীতের দিনে ঘন অন্ধকারে
প্রভঞ্জন, যেন তার সাফল্যে নিশ্চিত,

মেয়েটির গর্ব চায় ভাঙতে ছত্রাকারে
পরুষ আদরে তাকে বাঁধে দুর্বিনীত।

তবু সে তনুত্ব তার নিতে জয় করে
প্রেমিকের সব জোর ক্রমশ ফুরায়।
মেয়েটি সদর্পে তাকে নেয় না অধরে—
প্রেম তার অন্য কারো জন্যে দূরে চায়॥

আলেকজান্দার প্রোকোফিয়েভ
১৯০০-

মিল আর ছন্দ

মিল আর ছন্দ, কোনো শান্তি তোমরা দাও না আমাকে !
কিন্তু ঠিক শান্তি যেন চিরদিনই অজানা আমার ;
যেখানেই যাই, নেব তোমাদেরও সে পথের ডাকে,
এবং বন্ধুরই মতো পাবে তোমরা কড়া ব্যবহার।

জীবন থেকেই জেনো শিখতে হবে সাহসী ক্ষমতা,
কেননা সঠিক শুধু এ জীবনই, পথটা কঠিন,
অন্যপথে এ লড়াই যুঝে চলতে পাবে না যোগ্যতা,
ভেঙে পড়বে ভীত ত্রস্ত বাক্যে জেনো ব্যর্থ, দীনহীন।

অথবা শুকাবে তোমরা নিদাঘের দারুণ উত্তাপে ;
কিংবা হি-হি শীতে কাঁপবে, লক্ষ্যহারা হবে অচিরাৎ,
হয়তো তখন তোমরা পরাজিত বেদনার চাপে
খাড়াই পাহাড় থেকে পাবে নীচে ঝাঁপ-দেওয়া খাদ।

মিল আর ছন্দ, কোনো শান্তি তোমরা দাও না আমাকে !
কিন্তু ঠিক শান্তি যেন চিরদিনই অজানা আমার ;
যেখানেই যাই, নেব তোমাদেরও সে পথের ডাকে,
এবং বন্ধুরই মতো পাবে তোমরা কড়া ব্যবহার।

ভ্লাদিমির লুগোভ্স্কোই
১৯০১-৫৭

নক্ষত্র

নক্ষত্র, হে সুদূরের উত্তাপবিহীন ঠাণ্ডা আলো,
ছুঁচের মতোই সরু দীর্ঘ ফার-গাছে নেমে এসে
মিলাও, হে তারা, তুমি রাত্রি যেই দিগন্তে মিলালো ;
এবং গোধূলি এলে পুনর্বার জাগো দিনশেষে।

তোমার জগৎ দূরে পাখামেলা ঘূরন্ত আগুন,
যেখানে অণুর কেন্দ্রে দপ্ করে জ্বলে দীপ্ত শিখা।
কেন-যে আমার দিকে চাও ঠাণ্ডা বিরাগে দারুণ,
আমি তো মাটির বুকে তুচ্ছ এক সামান্য কণিকা !

হয়তো এক্ষুনি তুমি হঠাৎ দাউদাউ জ্বলে মৃত।
কিংবা শিখা ঐ স্তব্ধ হয়তো-বা বহুবর্ষ আগে।
অবং অক্ষম আলো আসে বৃদ্ধ-অন্ধ-আচরিত
লাঠি ঠুকে ঠুকে ধীরে পৃথিবীতে প্রীতির সংরাগে।

কিংবা ইন্দ্রজাল-গতি ও হৃদ্‌পিণ্ড রেখেছে বাঁচিয়ে ?
আমি তো ছায়ার ধুলো ! তুমি ব্যাপ্ত মহাবিশ্বে ; তবু
যেহেতু আমার চক্ষু আছে, মন আছে, তাই নিয়ে
যেহেতু ভাবতে পারি, সে কারণে তোমাদেরও প্রভু ॥

নিকোলাই জাবোলোৎস্কি
১৯০৩-৫৮

কবিতা পড়া

উদ্ভট আর বেশ মজাদার কবিতার বই—
কবিতা একে বলাই বাড়াবাড়ি।
লেখক যেন চেষ্টাতে তাঁর আজকে জয়ী—
টেপ-রেকর্ড উল্টো আড়াআড়ি!

অর্থবিহীন এসব কথার সংযোজনা
নিচ্ছে হয়তো আবিষ্কারের মেলায়।
কিন্তু খতম করে মানুষের সব সাধনা
লাভ কী এমন শিশুশোভন খেলায়?

আমাদের এই মহৎ মিষ্টি রুশ ভাষা কি
হবে পাখিদের কিচিরমিচির বুলি?
চিন্তার সার ছেড়ে শেষটা হবে পোশাকী,
অর্থবিহীন বোবা শব্দের ঝুলি!

মোটেই না। এই কাব্যভূমির শেষ সীমানা
মানচিত্রের মতোই স্পষ্ট আঁকা।
খেয়ালখুশির নাটক নয় তো, যার ঠিকানা
সঙের মতো ধাঁধার মধ্যে ফাঁকা।

এই জীবনের উৎসে যে-জন তৃষ্ণা মেটায়,
কাব্যরসকে বাল্য থেকেই জানে—
রুশ ভাষাকে ভালোবাসার মধ্যে সে পায়
প্রাজ্ঞতা ও সত্যেরই সন্ধানে॥

ইওসিফ উৎকিন

১৯০৩-৪৪

যদিবা আহত তুমি হও যুদ্ধে

যদিবা আহত তুমি হও যুদ্ধে, শোনো তবে প্রিয়,
তৎক্ষণাৎ চিঠি দিয়ে সে সংবাদ আমাকে জানিয়ো !
রাখব না তোমাকে তবে বৃথা প্রতীক্ষায়,
তোমাকে লিখব আমি প্রত্যেক সন্ধ্যায়—
বেশ বড়ো, আর প্রেমে-উষ্ণ হবে জেনো সে উত্তর।
সময়— তোমাকে আমি সুনিশ্চিত বলি—
নিশ্চিহ্নে সারাবে ক্ষত যা-কিছু সকলি ;
কিন্তু খাঁটি ভালোবাসা জেনো প্রিয় চিরায়ু অমর !

যদি আর কারো সঙ্গে দেখা হয়, হও অবিশ্বাসী,
লোকেরা এ কথা লেখে, পারো তুমি, হে প্রিয় প্রবাসী ;
বোলো তুমি সত্যি কথা, রেখো না আড়ালে।
হয়তো বা দেরি হবে, তবু শেষকালে
নিশ্চয়ই জবাব দেব, এটা তুমি জেনে রেখো স্থির।
অশ্রু তো ঝরবেই, দুঃখ— পাব তাও বটে,
তবুও আনব জোর মনে সে সংকটে।
সময় কাটবে, আর চিহ্ন মুছে যাবে সে ক্ষতির।

কিন্তু সৈনিকের ঐ শপথের অবিশ্বাসী হলে
কক্ষনো লিখো না চিঠি দুঃসাহসী সে সংবাদ বলে ;
সে চিঠি পাবে না জেনো উত্তর আমার,
ঘৃণায় তোমাকে আমি জানাব ধিক্কার,
ভীরুদের জন্যে জেনো একটি শুধু রয়েছে উত্তর :
সময়, এ কথা সত্যি, জেনো কালক্রমে
সারায় সকল ক্ষত শান্তির মলমে,
কিন্তু ভীরুদের প্রতি ঘৃণা—
সে যে নিরন্ত, দুর্মর !

লিওনিদ মার্তিনভ
১৯০৫-

জল

জল ?
অবশ্যই, জলই।
এবং এতেই তার পাবে নিশ্চয়তা ঃ
জলের ধর্মেই এতে সযত্নে পালিত ;
এটা ফোঁটা ফোঁটা পড়ে,
এটা প্রবাহিত,
এটা বিশুদ্ধতা আর স্বচ্ছতার পরীক্ষাও উতরে গেছে, তবু
এ কি তৃষ্ণা মেটায়, এতে কি
ধুতে পারো কাপড়চোপড় ?

এর পাড়ে ঝোপঝাড়, নলখাগড়া, কাশগুচ্ছ পাবে না কখনো,
গভীর রহস্যে আলো-আঁধারের জলে নেই রুপালি মাছেরা ;
দোলে না ঝাঁঝির লতা, এর ধারে কোনোদিন পাবে না তো কোনো
সুরেলা পাখির গান, ক্রন্দসী 'উইলো'র পাতা, নতশির চেরা।

জল ?
অবশ্যই, জলই ;
সব তথ্যে এটা প্রমাণিত,
যদিও জানে না কোনো ঝড়ের তরঙ্গ কিংবা দুর্ধর্ষ লড়াই।
আর তাই
এই সূত্রাকারে বাঁধা 'এইচ্$_2$ ও'-এর
এ 'অ্যাকোয়া ডিস্টিলেটা' ল্যাটিন নামের
সবই আছে যেটা পাবে জলেও নিহিত,
আছে,
সবই আছে, শুধু প্রাণ নেই এর ॥

চিহ্ন

বলো তো আমাকে
যখন বাড়িতে কারো দেখা করতে যাও,
হোক সে জমকালো
কিংবা শাদামাটা,
উন্মুক্ত সদর, দরজা দিয়ে কারো প্রবেশ, অথবা
সরু এক সিঁড়ি দিয়ে শুরু কারো হাঁটা,
গান শোনো
পিয়ানোর স্বরগ্রাম থেকে ইন্দ্রজালে,
বাড়ির কর্তার ভদ্র জিজ্ঞাসার কালে,
বলো তো আমাকে একবার
তুমি কি মেঝেতে কোনো চিহ্ন রেখে আসো
সযত্নে যা মুছে ফেলে তারা ?
অথবা আসার কালে তুমি যেই ভেজাও দুয়ার
বাড়ির কর্তারা সব চোখে চোখে জানায় ইশারা ?
কিংবা বলো শুনি
তারা কি হয়েছে খুশি তুমি দেখা করতে গেছ বলে,
আর, তারা হয়েছে ব্যথিত তুমি জানালে বিদায় ?
তুমি কি এসেছ রেখে কোনো চিহ্ন দৃশ্যের অতলে—
হৃদয়ে যা সমুজ্জল স্মৃতির আভায় ?

সেমিয়ন কির্সানভ
১৯০৬-

আমি আজ আমি

মৃত্যুর করি না গান,
গাই জীবনেরই জয়,
কেন— সে কারণগুলি বলে রাখি :
(কিন্তু হাসি নয়,
যেমন হাসেন ঐ
পরমাণু-পদার্থতত্ত্বের সংঘে জ্ঞানীজন,
কিংবা জ্যোতির্বিদ্—
যাঁদের দু চোখ সাঁটা মহাজাগতিক দূরবীনে)।
বিস্ময়টা নয়— ঐ নক্ষত্রমণ্ডলী :
কালপুরুষ,
        অভিজিৎ,
                বিশাখা ও উত্তরফাল্গুনী,
আর যত নীহারিকা থেকে দূর নীহারিকা আছে।
বিস্ময় বরং— ট্যাক্সি, রেলগাড়ি, আর মানুষের চোখ,
এবং কোণায় তার রেখাগুলি।
বিস্ময়টা নয়— ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে ব্রহ্মাণ্ড,
ঘুরছে, যাচ্ছে মিলিয়ে বুদ্‌বুদ।

বিস্ময় বরং— মানুষেরা ভাবতে পারছে,
এবং তাদের চিন্তা সব রন্ধ্রে আতিপাতি খোঁজে,
আর তাই দরজা ক্রমে মুক্ত উদ্‌ঘাটিত।
বিস্ময়— অনন্তকাল নয়।
বিস্ময়টা বরং— মাতৃত্ব ;
সবল দু হাতে যত্ন এবং আদর ;
রোগ থেকে শুশ্রূষায় আরোগ্যে ফেরানো।
বিস্ময়টা হল— আবিষ্কার ;

বিজয়ীর দুরন্ত চিৎকার,
"মিলেছে ! পেয়েছি খুঁজে ।"

বিস্ময় আসলে এই—
আমি আজ আমি ।

নিকোলাই রাইলেন্‌কভ্‌
১৯০৯-

দুটি কবিতা

১

শৈশবে আদরযত্ন আমরা তত পাই নি সেদিন,
আমরা যে উঠেছি বেড়ে সীসে-রঙ আকাশের তলে।
নিয়তি কঠিন হাতে কাঁধে থাবা রেখে ক্ষমাহীন
চেয়েছে দু চোখে, তার দৃষ্টি স্থির রূঢ় কোপানলে।

কাজেই যদি-বা তুমি দেখতে পাও অ-স্মিত নয়ন,
আমরা বেআদব রুক্ষ, এটা মনে কোরো না কখনো।
বরং হৃদয়ে বুঝো, আমাদের এ অন্তঃকরণ
সখ্যতায় মুগ্ধ, খুলি ভালোবাসা পেলে এই মনও।

২

কেটে যাবে দিন, ক্রমে আমাদের সন্তানেরা এসে
বিস্ময়ে ভাববে, আমরা যুদ্ধের হুংকারে কী করে যে
শুনতে পেয়েছি গাছে পাখিদের গানের উন্মেষে ;
বসন্তে মাটির ঘ্রাণ বুকে টানতে পেরেছি সতেজে।

সূর্য উঁকি দিলে ভোরে কী রকম ভেবেছি সেদিন
নিশ্চয়ই লাইলাক ফুল ইতিমধ্যে ফুটেছে কত-না,…
সত্যি, সৌন্দর্যকে মনে আনে না তো চিন্তার দূরবীন,
যৌবনেরই তৃষ্ণা শুধু এনে দেয় রূপের দ্যোতনা।

ওল্‌গা বার্‌গল্টস
১৯১০-

আমার এ ভয়

যাদের বেসেছি ভালো পাছে আমি তাদের হারাই
কখনো আবার···
সযত্নে হৃদয়ে তাই মানুষের প্রীতি যত পাই
স্মৃতি রাখি তার।

এতে যদি হাসে কেউ— তাতে মোটে নই বিচলিত!
অদূরে সময়—
সেদিন বুঝবে তারা, বুকে পাবে জেনো স্বয়ংবৃত
আমারই এ ভয়।

নিকোলাই গ্রিবাচেভ
১৯১০-

সুখ

প্রকৃতিতে বিশৃঙ্খলা, তদুপরি যুদ্ধ তো আছেই,
এবং অনেকে দেখি প্রেমকেও বানায় নরক—
মনে হয় দোষ কিছু বইতে হবে আমারও কাঁধেই,
অংশত আমিও বটে অনেকটাই দোষের পোষক :

কারণ যেটুকু শক্তি ছিল তাও হয় নি প্রয়োগ,
যে পথ উৎকৃষ্ট, আমি সেটা বাছতে হয়েছি অক্ষম ;
ছোটোখাটো বিতর্কেই ইতস্ততঃ কেটেছে সুযোগ,
বৃহত্তর যুদ্ধ কিন্তু নজরে পড়ে নি একদম।

কিন্তু কোনো কৈফিয়তে আমি দোষ চাই না কাটাতে ;
ফেলি না চোখের জলও— কতটুকু বলো তাতে লাভ ?
জীবনের রূঢ় হাওয়া টেনে নেয় ক্ষমাহীন হাতে,
তারই পথে এ যাত্রীও দেখে খাঁটি গন্তব্যের ছাপ।

প্রতিটি শিশুই বাড়ে, বেড়ে চলে গমের মঞ্জরী ;
প্রতিটি হৃদ্‌স্পন্দ যেন মধুর সুরেলা এক গান ;
এ সবই নিয়ত সামনে যেতে বলে দিবা-বিভাবরী,
অ-জিত শৃঙ্গের দিকে বলে নিত্য হোক অভিযান।

এখন নির্মাণ শুধু ; সৃষ্টি চাই ; দুঃখ তো অযথা।
এখন ক্ষতিকে মেনে বেপরোয়া এগোব সম্মুখে ;
জোর করে দরজা খুলে আগামীতে সমুত্তীর্ণ সদা
যা-কিছু সেখানে আছে সবই আমি লুফে নেব বুকে।

আমাদের সব কাজে যোগ দেব, যেটুকু ক্ষমতা ;
এতেই উত্তীর্ণ হব ঝড়ে-জলে বছর বছর ;
শুধু এই— জীবনের মূল্যবোধে এই শেষ কথা
চূড়ান্ত স্থখের স্পর্শে ধন্য করে মানুষের ঘর ॥

সারগাই পোডেলকভ
১৯১২-

রূঢ় কথা

রূঢ় কথা চতুর্দিকে, সংখ্যা তার নাম্‌তায় অঢেল ;
আকাশে যত-না তারা তারও চেয়ে তারা সংখ্যাধিক ।
আমাদের কালি ছুঁড়তে শত্রুরা তো উৎসাহে উদ্‌বেল ;
এবং তাদের যত্ন আসলে তো ফাঁদ যেন ঠিক ।

ওদেরই মতো কি আমরা করব ? না না, ঠিক বিপরীত !
আমাদের অন্য আশা— গানই তার একান্ত কামনা ।
অন্য এক দাহ যেন জ্বালে তার অগ্নির সংগীত ;
ঈর্ষার বিরোধী এক আর্তি আনে অজ্ঞাত দ্যোতনা ।

ইয়ারোস্লাভ স্মেলাইয়াকভ
১৯১৩-

আমাদের যুগ

সময় পাই না আমরা খয়রাতির মতো,
সুকঠোর কাজই শুধু কর্তব্য সবার।
কথা শিখি, তারো জন্যে থাকে যত্ন কত;
বড়ো কাজ সহজেই হয় না উদ্ধার।

অদ্বিতীয় সে ক্ষমতা আজ আমি ধরি—
তার ও আমার কালে সবার কল্যাণে
কত যে জাঁকালো ফুর্তি প্রত্যাখ্যান করি,
সহজ সাফল্য দূরে ঠেলি তুচ্ছ-জ্ঞানে।

প্রতিরক্ষা গড়ি আমি সৈন্যদের কাজে,
লোহা ও পাথর নিত্য করি ব্যবহার।
নিরন্ত শ্রমের ঘর্মে সেই কর্ম-মাঝে
হৃদয়ে কঠিন ধর্ম পেয়েছি লোহার।

তুমি তো ভালোই জানো, বিরূপ নিন্দায়
শেয়ানা হব না, কিংবা পারবে না হারাতে।
বোমার আঘাতে কিংবা বেয়োনেট-ঘায়
সরাতে পারবে না জেনো একটুও তফাতে।

আমি শুধু বড়ো নয়, হয়েছি বিপুল :
চেষ্টা করো শক্তি দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্ব দিতে!
পিছনে আমার দেখো সহাদ্রি অতুল—
ব্লাস্ট-ফার্নেসের সারি অতন্দ্র চিমনিতে।

আমি শুধু বড়ো নয়, হয়েছি বৃহৎ।
দেখো দীপ্ত চিন্তারেখা আমার কপালে,
ঠিক যেন লাঙলের বিঁধ-আঁকা পথ—
সকালে শিশিরভেজা শতসূর্য জ্বালে।

গঠনের বড়ো কাজে লিপ্ত আজ আমি,
অথচ এখানে যুদ্ধ ঘটেছে সেদিন ;
আমার বিজয় থেকে পাবে অনুগামী
এ মহাযুগের শিক্ষা, গৌরবে আসীন ॥

বৃদ্ধেরা

খুব বেশি ব্যস্ত নয়, অথচ ঝিমিয়ে নেই ঠিক!
যৌবনের শখ-ইচ্ছা বহুকাল হয়েছে দমিত ;
ছড়ি ঠুকে চলে যেন রাগ তার যথেষ্ট অধিক—
বৃদ্ধেরা আগামী দিন লক্ষ্য করে চলে ধৈর্যে স্থিত।

তাদের আত্মীয় আছে, প্রতিবেশী তাদের স্বজন ;
শান্ত তারা এ কারণে, যেহেতু হৃদয়ে জানে তারা :
কর্তব্যই করে যেটা নয় শুষ্ক কাজের মতন,
তাদের দায়িত্বে তারা অতিক্রুত দিয়ে চলে সাড়া।

সামান্য কারণে মেতে নষ্ট তারা করে না সময় ;
জীবনের ছোটোখাটো দুঃখে তারা নয় বিচলিত ;
বাহিরে নরম বলে যদিও কখনো মনে হয়
মনে কিন্তু লৌহদৃঢ় জেনে রেখো বৃদ্ধেরা নিশ্চিত।

তাদের পাজামা কিছু ঢিলেঢালা যদিও কখনো,
ফ্যাশানেও বটে তারা মাঝেমাঝে কিছু উদাসীন,

নোয়ানো শরীরে তারা স্বভাবেও কিছুটা পুরনো,
তবুও মাধুর্য কিছু আছে তারো জেনো অন্তর্লীন।

প্রাচীন সময় থেকে একেবারে একাল অবধি
শীতের নরম রোদ যে-রকম আদরে মধুর,
যে-কোনো জাতিই হোক, শক্তি তার থাকে কিছু যদি,
পবিত্র ঐতিহ্য নিয়ে স্বপ্নে তারা থাকে ভরপুর।

সম্মুখের গতি জেনো থেমে যেত তবে একেবারে—
আমরাও হতাম তবে নতজানু নিতান্ত মাটিতে,
যদি-বা বৃদ্ধের প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা-উপচারে
না দিতাম অকুণ্ঠিত আমাদের প্রীতির সংগীতে।

ভিকতর বোকভ
১৯১৪-

আ মি এ মা নি না

এ কি হতে পারে— এই গ্রহ নয়া ব্লিৎসের শিকার ?
এ কি হতে পারে—একটা রকেটেই হবে এ চুরমার ?
আমাদের পাখি স্তব্ধ, সেতু হবে মরুচেতে মলিন,
আমাদের ফুল আর মানুষেরা হবে ধূলিলীন ?

এ কি হতে পারে— আমরা মানুষেরা কিছু নই মোটে,
এত ছোটো, ক্ষুব্ধ নই পতনেরও গভীর সংকটে ?
শামুকের মতো তুচ্ছ— খোলা-ঢাকা শাঁস যেন ঠিক,
যা নাকি প্রোটিন-কোষে তৈরি হয় যেন আকস্মিক ?

আমি এ মানি না। আমি মোটেই মানি না এই কথা।
যুক্তি যে বিদ্রোহ করে! ভাবতেও পারি না সে সত্যতা।
আমরা কি সে জন্তু হব চাঁদ দেখে যে নাকি চিল্লায় ?
কিংবা সে বর্বর হব— বর চাইব নিজের হিল্লায় ?

আমি এ মানি না। আমি পেয়েছি যে মনের সম্পদ।
ছুঁড়েছি স্পুৎনিক শূন্যে, যাতে পায় মনুষ্যজগৎ
যুদ্ধের আতঙ্কে মুক্তি চিরকাল, বিগত সন্তাপ।
মানুষের মুখ থেকে হাসি মোছা কী জঘন্য পাপ।

ঐ মে য়ে টি

'ঐ মেয়েটি আমার মধ্যে জাগায় আলোড়ন !'—
অসংকোচেই লজ্জাবিহীন করছি হে স্বীকার।
জীবন করে নিশ্বসিত ও-তার চুম্বন ;
তার ছোঁওয়া তার আদরে মন জ্ঞান হারায় তার।

বলতে গেলে অসাধারণ সে নয় তো কোনো মতে,
পিতামাতা কিংবা কাজেও নেই তার বৈশিষ্ট্য।
সবাই তাকে যেমন-তেমন দেখে যাবার পথে,
আমিই শুধু হই বুঝি তার হাসিতে আবিষ্ট!

গোপন তথ্য কী তার এবং রহস্যটা কী যে?
দেহশ্রীতে পুরাকালের লাবণ্য নেই মোটে;
পারিবারিক গুণগরিমায় মুগ্ধ সে নয় নিজে,
দৈবী ভাবের আদলও নেই মুখ-চোখ বা ঠোঁটে।

তার গলা ঐ!
তার গলা! সেই
সজীব এবং গভীর,
আগুন জ্বালে প্রাণে।
উদাসভাবে আমি বেড়াই ঘুরে,
মনে কিন্তু শুনি কেবল বজ্রের আহ্বানে।

চোখ দুটি তার নীল যেন বা শান্ত কোনো সাগর,
নাতিশীতল-উষ্ণ সাগর যেমন গাঢ় নীল;
কিন্তু আমার বুকের মধ্যে জেগে উঠছে কী ঝড়!
কবিতা এক আকার খুঁজে হাতড়ে বেড়ায় খিল!

মার্গারিটা আলিঘের
১৯১৫-

ছোটো হাতিটা

ছোটো হাতিটা, আমাদের এই দারুণ শীতের দেশে
উপহারের দ্রব্য হয়ে এলে আমার ঘরে
খামখেয়ালির ঝোঁকে তোমায় আনে নি কেউ হেসে।
এই উপহার যে দিল তার প্রেম আছে অন্তরে।

কলকাতার ধুলিমলিন দোকানে এক কোণায়
শুঁড় দুলিয়ে চোখকে যে তার নিয়েছ তুমি টেনে,
…তার পরেতে ঘণ্টা কমে এল মিনিট গোনায়,
দিনগুলো সব ঘণ্টা হল ওড়ার নিয়ম মেনে।

তুমি আর সে অতঃপর তো জেট্-ছোঁড়া এক পাখির
রুপোলি সেই ডানার হাওয়ায় ছুটে চললে স্বতই।
এবং আমার মস্কো-ঘরের পরিবেশ যে অধীর
চন্দনের অন্যলোকের ঘন গন্ধে অথৈ।

তাই তো আমার হৃদয় আজ চন্দনের গন্ধে
আনন্দিত গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে আছে ;
ছোটো হাতিটা, তোমার আমার ভালোবাসার ছন্দে
হঠাৎ যেন ভারতবর্ষ এগিয়ে এল কাছে।

ইয়েভ্‌গেনি দল্‌মাতভস্কি
১৯১৫-

তারা আজো বলে…

তোমরা ছোটো ছিলে, বন্ধু, আমার চেয়ে তো বহু ছোটো ;
সে তরুণ বয়সেই মধ্যপথে থেমে গেল গতি।
তবুও জীবন-সত্যে তোমরা আজ স্পষ্ট হয়ে ওঠো,
কেন যে গিয়েছ যুদ্ধে অর্থ তারও বুঝেছি সম্প্রতি।

কৃতিত্ব যদিও কম মনে হয়, আসলে সে বেশি ;
অন্যায়ও করেছ হয়তো, মনে তবু ছিলে তো সরল।
মন্দ যা সেটুকু ভুলি, বেশি জানতে নই ছিদ্রান্বেষী ;
যা-কিছু গোপন তুচ্ছ সেটা ভেবে হব না চঞ্চল।

কী দীর্ঘ জীবন আমি বেঁচে আছি, সম্পূর্ণ ও দ্রুত !
যদিও সুতৃপ্ত নই, ক্ষুধা আজো আছে অগণিত।
ধীরে ধীরে হৃদয়েও রূপান্তর হয় অনুস্যূত ;
পুরনো বন্ধুর স্মৃতি অবশেষে সেখানে আদৃত।

এবং আমার কাছে তারা ঠিক মৃত না— বিশ্রামে ;
অথবা ঘুমন্ত যেন খনির শ্রমিক, কাজ শেষে ;
কিংবা যুদ্ধ-বিমলিন সৈনিকেরা যে-রকম থামে ;
তেমনি বৃদ্ধ না-হতেই এরা চলে গেল যুবাবেশে।

এরা যেন ক্লান্ত, যেন পথে পথে সারা রাত ধরে
প্রেমিকার সঙ্গে ঘুরে বাড়িতে পৌঁছয় তাকে ভোরে।
আকস্মিক অঘটন বেদনার, তবু ঘটে থাকে—
তাদের তরুণ কণ্ঠ, পরিচিত, দূর থেকে ডাকে :

“ভণ্ডদের ভয় নেই, খোশামুদে যাক মিথ্যা বলে ?
হে প্রবীণ, তোমাদেরই সঙ্গে জেনো রয়েছি আমরাও
যা বলতে সময় পাই নি, বোলো সেটা তোমরাই সকলে।
যা গাইতে সময় পাই নি, তোমরাই সে গান আজ গাও।”

কনস্তান্তিন সিমোনভ
১৯১৫-

আমার জন্যে প্রতীক্ষাতে থেকো

আমার জন্যে প্রতীক্ষাতে থেকো, ফিরব বাড়ি।
প্রতীক্ষাটা একটু বেশি হবে।
বুকের 'পরে ঢাক বাজিয়ে বৃষ্টি আড়াআড়ি
ঝরবে যখন, প্রতীক্ষাতে রবে।
তুষার-ঝড় ফুঁসবে যখন, কিংবা এলে গ্রীষ্ম,
থেকো তুমি আমার প্রতীক্ষাতেই ;
যখন আমার আত্ম-বন্ধু-পরিজনের বিশ্ব
প্রতীক্ষাতে হারিয়ে ফেলবে খেই।
প্রতীক্ষাতে থেকো যখন দূর-বিদেশের ডাকে
চিঠিপত্র আসবে না আর মোটে।
তুমি সজাগ, অন্য লোকের প্রতীক্ষার বাঁকে
বিস্মৃতির চিহ্ন হয়তো ফোটে।

প্রতীক্ষাতে থেকো, আমি ফিরে আসব ঘরে।
রাগ কোরো না মোটেই তাদের প্রতি
যারা হয়তো ভাববে দেখো আর কিছুকাল পরে
ভুলে গেলেও নেই তেমন ক্ষতি!
আমার ছেলে এবং মায়ের দুঃখ হবে ভেবে—
এতদিনেও আর আছি কি বেঁচে!
নিকটতম বন্ধুজনও এটাই ধ'রে নেবে—
আশায় থাকার সময় এবার গেছে।
স্মরণসভার পানপাত্র খালি করুক তারা,
গভীর শোকে নীরবতায় মগ্ন ;
তোমার পাত্রে হাত দিও না তুমি আপনহারা,
তোমার চলুক প্রতীক্ষারই লগ্ন।

আমার জন্যে প্রতীক্ষাতেই থেকো, ফিরব ঘরে ;
মৃত্যুকে ঠিক দেব ঘৃণার ধিক্কার।
'জোর বরাত যে!' বন্ধুরা সব দম বন্ধ করে
মনে মনে করবে তখন চিৎকার।
তারা কিন্তু দেখতে এটা পাবে নাকো সেদিন
—প্রতীক্ষাতে রয় নি বসে যারা—
আমার জন্যে প্রতীক্ষা এই তোমার ক্লান্তিবিহীন,
তার জোরেই কাটিয়েছি সব ফাঁড়া।
নরক দিয়ে হেঁটেও কেন আঁচ লাগে নি গায়ে
তুমি-আমিই জানব দু জন মিলে ;
কারণ— যেমন থাকতে হয় প্রতীক্ষার ছায়ে,
জানতে এবং তুমিই তেমন ছিলে॥

মিখাইল ছুদিন
১৯১৬-

সেতুর গান

ঘৃণা দিয়ে তৈরি সেতু
    লোভের সেতু যত—
সে সব কবে মানুষজাতির হল কাজের মতো ?
    বিপদ দিয়ে তৈরি সেতু
    লড়াই-সেতুগুলি—
ভাঙো তাদের, আর গড়ো না, হোক সে পথের ধূলি !

    কিন্তু তবু থাকে অনেক
    সেতু বাঁধার ফাঁড়ি ;
চওড়া, তবু মানুষ তাকেও পারবে দিতে পাড়ি ।
তেমনি একটা মহৎ সেতু তৈরি করি তবে
    দেশের সঙ্গে দেশ ও হৃদয়
    হৃদয়ে যোগ হবে ।

এবং সটান সেই সেতুতে মাথা তুলবে সেদিন
হাত বাড়ানো মৈত্রী, সে যে বাধাবন্ধবিহীন ।
সারা মানুষজাতির প্রতি ডাক দেবে নৈপুণ্য,
    সেতু গড়বে পৃথ্বী থেকে
    অসীম মহাশূন্যে ।

আমরা দু জনে মিলে

আমরা দু জনে মিলে দেখেছি কালের যাত্রা, আর
ছিলাম তোমারই সঙ্গে একযোগে জীবনের নাটে—
এখন তোমাকে ছাড়া পরিচয় কী বলো আমার ?
ওসব দৃশ্য ও শব্দে নিরর্থ কী করে দিন কাটে ?

বসন্তের মনোরম মাঠে মাঠে আজ লক্ষ্যহারা
নিরানন্দ পথে পথে অকারণে আমি ঘুরে মরি ।
নিতান্ত একাকী আমি বেঁচে আছি দেখ তুমি-ছাড়া,
অর্ধ-স্বপ্ন-জাগরণে আমি পথ-পরিক্রমা করি ।

সুন্দর প্রান্তর, আর উঁচুনিচু দূর উপত্যকা ;
তরুচূড়া যেন খোঁজে বাহু তুলে আকাশের সাড়া—
সবই দেখি, থাকে তবু সে সকলই অর্ধপলাতকা,
যদি-না তোমারই সঙ্গে একযোগে চোখে পড়ে তারা ।

আনন্দে ঐশ্বর্যময়ী এ পৃথিবী করে না তো খুশি ।
তুমি না রইলে আর এ জীবনে কী থাকে সঞ্চয় ?
রাত্রির দাক্ষিণ্য ছাড়া এ কেবল দিন অমানুষী,
অথবা এ যেন রাত্রি, শেষে যার নেই সূর্যোদয় ।

ভাসিলি ফায়োদোরভ
১৯১৮-

নিজের কবিতার প্রতি

তোমার দিকে তাকিয়ে আছি, কবিতা,
যেমন বেদনায়
হতাশাকে সরিয়ে দূরে মা
বুকের মধ্যে বুঝতে পারেন নিজে—
ছেলেরা তাঁর জন্মেছিল বটে
ভালোবাসার ঘরে,
তবুও তারা মূক-বধির, এবং
থাকবে তেমনি ; সে দুর্দৈব কী যে !

এর জন্যে দোষটা যে কার, কেন—
ঝড়ো দিনের দুঃখ, নাকি
বংশগতির দোষ, অথবা
এই মাথা, যা
আমার দেহে আছে ?…
তোমরা আমার, আমি বুঝতে পারি
তোমাদের ঐ প্রতি কথাই, তবু
রাখতে হবে এমন করে যাতে
মানেটা হয় স্পষ্ট সবার কাছে।

দেখছ তো ঐ চোখের সমুদ্র—
অধৈর্য, আর কড়া,
নির্মম ঐ চোখগুলি আজ
বক্ষ যেন দু ভাগ করে কাটে ;
ও চোখগুলি থামিয়ে দেবে তোমায়
খোলা দরজা-পথে—

অন্যলোকের মনের রাজ্যে
বুকেরই চৌকাঠে।
কিন্তু জেনো : বিপুলা এই পৃথ্বী,
এবং উদার সে যে ;
শীতের বরফ ভয় কোরো না, কিংবা
শ্রাবণ দিনের বৃষ্টি।
এগিয়ে চলো, সাহস করে এবার
লোকের মনে ঘা দাও গিয়ে এবং
ঔদাসীন্য পেলে
দ্বিতীয় মনের দরজাতে দাও দৃষ্টি।

সাগেই অর্লভ
১৯১০-

গান ছাড়া এ পৃথিবী

গান ছাড়া এ পৃথিবী বড়ো ঠাণ্ডা ঠাঁই,
যে-কোনো হাওয়াই যেন বয় বাধাহীন।
জন্ম থেকে সকলেই আমরা গান চাই,
গানেই মানুষ হয়ে উঠি চিরদিন।

গান-যে কী করে জন্মে জানে না তা কেউ—
সৈন্যরা শহরে ঢুকছে কুচকাওয়াজ করে,
কারো কণ্ঠে একটি সুর তোলে হয়তো ঢেউ,
মেয়েরা নুইয়ে মাথা ধুয়ো তার ধরে।

বার্চগাছে পাতাগুলো কাঁপে, ঝল্‌কে ওঠে,
হৃদয় যে সাড়া তোলে আরেক হৃদয়ে ;
আবেশে আকাশে আলো আধো হয়ে ফোটে,
আরেক গানের কলি জাগে তার লয়ে।

যেমন মর্মর বনে, মানুষ জন্মায়,
যেমন রাতের পরে দিন, বৃষ্টি ঝরে,
তেমনি গান গাওয়া হবে চিরায়ু ধরায়,
একার সৃষ্টি না, দায় সবারই উপরে।

সেমিয়ন গুডজেঙ্কো
১৯২২-৫৩

আক্রমণের আগে

সৈন্যেরা মৃত্যুর দিকে এগোবার কালে গান গায়,
কিন্তু ঠিক পূর্ব-মুহূর্তেই
তারা কেঁদে উঠতে পারে।
লড়াইয়ে সবার চেয়ে সে সময়ে বেশি ভয় পায়
যে কাল মৃত্যুর ঠিক মুখোমুখি আগে একেবারে।
মর্টারের গোলা লেগে ছিটকে ওঠে উৎক্ষিপ্ত তুষার,
সেটা আর শাদা নয়, মাটি-মাখা নিতান্ত সে কালো।
শাই করে গোলা ছুটল, বন্ধু পড়ল— প্রাণ নেই আর,
এবং জীবন্ত আমি—
পাশ দিয়েই মৃত্যুটা ডিঙালো।
এর পরই আমার পালা—
ঠিক যেন ঘাড়ের ওপর।
আমার দিকেই ওরা তাক করছে, জানি তা নিশ্চিত।
এটা '৪১ সাল,
সব থেকে দুঃসহ বছর ;
তুষারেই জমে গেছে, পদাতিক এই বাহিনী তো।
যেন-বা চুম্বক আমি, আমারই পরীক্ষা হচ্ছে বুঝি,
প্রতিটি গোলাকে যেন কাছে টানছে আমারই শরীর ;
এই তো আবার মৃত্যু পাশ দিয়ে ছুটল সোজাসুজি,
একটা বিস্ফোরণ,
আর লেফটেন্যাণ্ট আমার মৃত, স্থির।…
কিন্তু এতক্ষণে আমরা প্রতীক্ষায় প্রায় ধৈর্যহারা ;
হামাগুড়ি দিয়ে তাই
ট্রেঞ্চ থেকে বাইরে চলে আসি ;
জমাট ঘৃণাই যেন সারা পথ মনে দিচ্ছে তাড়া ;

বেয়োনেটের মতো তার খোঁচা বুকে এখন আগ্রাসী।
এর পরই ঘটল এক হাতাহাতি লড়াই,
এবং
গলায় ঢাললাম ঠাণ্ডা ভদ্‌কা আমরা হাঁড়ি থেকে নিয়ে,
তারপর নখের নীচে অন্য মানুষের লাল রঙ
রক্ত অবিচল মনে তুলে ফেলি নিশ্চিন্তে খুঁচিয়ে।

বুলাত ওকুজাভা
১৯২৪-

খোলা দরজার গান

তুষার-ঝটিকা রাত্রে, জন্তু যেন, যখন গর্জায়,
বিরাম না-ঘটে তার গোঙানির ডাকে,
তখন এঁটো না খিল শশব্যস্তে তোমার দরজায়,
তখনো কপাট যেন স্থির খোলা থাকে।

যদি-বা তোমাকে যাত্রা করতে হয় সুদূরের পথে—
দুঃখকষ্ট চিরসঙ্গী যেখানে তোমার,
যাবার সময় যেন এ নিশ্চিতি থাকে সর্বমতে
ঘরে তুমি রেখে যাচ্ছ উন্মুক্ত দুয়ার।

নীরব রাত্রিতে যদি নিতে হয় তোমাকে বিদায়,
ফেরার না থাকে কোনো কল্পনাও মনে,
অন্তর তোমার যেন স্থির এক অগ্নি রেখে যায়—
জ্বলন্ত যা পাইনের গুঁড়ির দহনে।

সাদর উষ্ণতা যেন থাকে সেই গৃহের ভিতরে,
আর থাকে আরামের যত্নে একাগ্রতা।
কিছুই ঘটে না ভালো খিল তুলে দিলে বৃথা ঘরে,
তালা তৈরি মনে হয় নিতান্ত অযথা।

কনস্তান্তিন ভান্‌শেনকিন
১৯২৫-

ঘরে-ফেরা সৈনিক

যুদ্ধ থেকে অবশেষে ফিরেছে সে ঘরে।
আত্মীয় অতিথি যারা গিয়েছে সবাই ;
বউ তার মৃদুপায়ে কাছে আসে সরে ;
কোমল শয্যায় স্বামী পেয়েছে যে ঠাঁই।

থালা-বাটি সবই মেয়ে রেখেছে গুছিয়ে ;
দুটি একটি সিগারেট টুকরো খুঁটে তোলে ;
টেবিলের ছিরিছাঁদ দ্রুত ফিরে দিয়ে
তারপরে হাত খালি, কাজ নেই বলে।

স্বামীর কোটের হাতা তোলে কী গরবে
কপোলের পাশে, আর রাঙা সে লজ্জায় ;
আলোটা নেভায়, পাশে আড়ালে নীরবে
বেশবাস খোলে, আর ঢোকে সে শয্যায় ॥

ইয়েভগেনি ভিনোকুরভ

১৯২৫-

প্রিয়তমাকে দেখলাম আজ কাপড় কাচছে সে-যে

প্রিয়তমাকে দেখলাম আজ কাপড় কাচছে সে-যে—
কাঁধ ছুটি তার ছুলে উঠছে টবের পাশাপাশি,
হাত ছুটি তার সাবান জলের ফেনায় চলছে নেচে,
এবং শূন্যে তুলে ধরছে ভেজা কাপড়ের রাশি।

পিছলানো এক সাবান টুকরো ধরতে চায় সে জোরে—
কাপড়গুলো জলে রাখলে ফোলে ডোবার আগে।
অল্প আলোয় ঝলকে ওঠে ঘাড়ের ঢালু ভরে
ছোট্ট নরম খাঁজগুলি তার, দেখলে কেমন লাগে!

প্রিয়তমাকে দেখলাম আজ কাপড় কাচছে সে-যে।
ভুরুতে তার ফেনা লাগবে এই ভয়েতেই বুঝি
কনুই দিয়ে কায়দা করে কেমন ফিরিয়েছে
কাঁকই থেকে ফস্‌কে নামা আলগা চুলের গুছি।

কাঁধ ছুটি তার আস্তে নড়ে, চোখ তুলে সে তাকায়
দূর আকাশে, এবং মৃছ বিষণ্ণতার স্বরে
নিচু গলায় গাইল সে গান, জানল না দোর গোড়ায়
কখন থেকে দাঁড়িয়ে আমি, নয় সে বেশি দূরে।

সূর্যাস্তের আদ্যিকালের জৌলুশ যে তখন
জানলা দিয়ে এসে কেমন জড়িয়েছিল তাকে,
সোডা সাবান ব্লিচিং গুঁড়োয় ঈষৎ ক্লিষ্ট-মন,
চোখ ছুটি তার কুঁচকে হঠাৎ কেমন চেয়ে থাকে।

এর চেয়ে তো ভালো দৃশ্য সংসারে আর নেই,—
দেশের যত শহর আছে দাঁড়াক দিয়ে সার,—
মিষ্টি নরম হাত দুখানি, চোখের চাওয়া সেই,
ইচ্ছে-ভরা দৃষ্টি সে যে, উদাস বেদনার।

য়ুলিনা দ্রুনিনা

১৯২৫-

'রাই' ফসল কাটা হয়নি

'রাই' ফসল কাটা হয় নি, পড়ছে ঢলে :
সৈনিকরা দলে যাচ্ছে পায়ের তলায় :
আমরাও তো
            মেয়ে যদিও, যাই সকলে—
ঠিক যে রকম ছেলেরা যায়।

না ও তো নয় কুটির যেটা উঠছে জ্বলে :
যৌবনও যে আমার ওতেই ছাই হয়ে যায়।
যুদ্ধে এখন মেয়েরাও তো যাচ্ছে চলে—
ঠিক যে রকম ছেলেরা যায়।

রবার্ত রজদেস্তভেন্স্কি

১৯৩২-

শোক গাথা

(অংশ)

স্মরণ রেখো !
দ্রুত যদিও চলছে ধারা
রাত্রি-দিনের
সম্মুখে—
স্মরণ রেখো !
তাদের কথা, মৃত যারা আজ,
প্রীতির ঋণ কি
যায় চুকে ?—
স্মরণ রেখো !
এ'ঋণ আজো জীবন্ত, নেই
অশ্রুতে বা দুঃখতে
কোনোক্রমেই
তার উশুল,
আমাদের তো রাখতে হবে
বিশ্বাসটা তাদের 'পরেই
আজকে এবং আগামীতেও
হয় না ভুল !

আমাদের এই স্বপ্ন যত,
এবং গান
আর যত সব আনন্দ
যা পাচ্ছি আজ
এই জীবনে,
সে তো দারুণ মূল্যে কেনা

রক্তঝরা যুদ্ধে, সেটা
নেই কি মনে!
শোনো আমার কথাটা এই :
সকল শক্তি দিয়ে আমি
বলছি আজ
স্মরণ রেখো!
প্রতিটি নিশ্বাসে আর
প্রতিটি হৃদ্‌স্পন্দন যা বুকের মধ্যে
তোলে আওয়াজ—
স্মরণ রেখো!

এমন কি এই গান আমাদের
তারায় ভরা আকাশখানি
যখন ভরে—
স্মরণ রেখো!
তখন ঐ কণ্ঠগুলি শুনো তোমরা,
কালের মুঠি যাদের গলা
স্তব্ধ করে—
স্মরণ রেখো!
ছেলেমেয়েদের বোলো, কী করে
শান্তি এই
হয়েছে জেতা—
স্মরণ রেখো!
এবং যেন ছেলের ছেলেও
বার্তা এই জানতে পায়
কঠিন-চেতা :
স্মরণ রেখো!

নতুন যুগের স্বাগত গাও
দরজাতে যা

দাঁড়িয়ে আছে,
হে বিশ্বজন!
হত্যা করো সে জন্তুকে
যুদ্ধতে খুন শানায় যা
গলার কাছে
হে মুক্ত মন!
এবং আমরা ভাসব যখন
জয় করা ঐ মহাশূন্যে
মাথার 'পর—
স্মরণ রেখো!
বন্দনা গাও তাদের যারা
মৃত কিন্তু অপরাজিত,
তাই অমর—
স্মরণ রেখো!

আঁদ্রেই ভজ্‌নেসেন্‌স্কি
১৯৩৩-

মাটি

খালি পায়ে আমরা সব মাটিতে হাঁটতে ভালোবাসি,
এই মাটি, বাষ্প-ওঠা, নরম, মধুর।
কোথায় সে ?
ইথিওপিয়াতে কি ?
হ্যাভানাতে ?
কিংবা ছায়াচ্ছন্ন কুঞ্জ রিয়াজান-এ ?
নাকি রৌদ্রজ্বলা কোনো 'সাভানা' প্রান্তরে ?
অথবা সে বহুদূরে ?
হয়তো নিজেরই জন্মস্থানে ?
আমরা মানুষ।
আমরা ভালোবাসি হাঁটতে মাটির উপরে।
এরই ধারা, মুক্ত হয়ে, আমাদেরও মধ্যে প্রবাহিত ;
কিন্তু জন্ম থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন রয়েছি মাটি থেকে,
আমরা শহরবাসী, বিচ্ছিন্ন কাজেই
পাথর, অ্যাশফল্ট, রেল, মোটর গাড়িতে।···
তবু অভ্যর্থনা করি হাসি মুখে চারাগাছ দেখে,
গ্রানিট পাথরে ফুঁড়ে যখন সে ফোয়ারার মতো উর্ধ্বে উৎসারিত।
আমি স্বপ্ন দেখি এক পৃথিবীর যাতে
ট্রেঞ্চ কিংবা নেই বাধাবন্ধ ;
নেই যুদ্ধ বিগ্রহের দুঃসহ সে গন্ধ,
আবৃত যা জামিরের গাছে,
পূর্ণ যা স্বপ্নের জ্যোতি দিয়ে
যে জগতে বৃষ্টি নামে
উদ্‌ভাসিত অ্যালুমিনিয়ামে,
এমন জগৎ যেটা নারীদের,
ট্রেন চলে যেখানে সতত,

গুচ্ছ গুচ্ছ পাকা ফলে ভরা,
শস্যভারে নত,
যে মাটিতে জাদু থাকে, মানুষের দীপ্ত ইন্দ্রজাল,
মৃদঙ্গ বাঁশির বাদ্যে
যার গান আনন্দে উত্তাল !···
হয়তো বা মঙ্গল গ্রহেই
এ পৃথিবী থেকে গিয়ে আগন্তুক কোনো
হাতে নেবে এক মুঠো উষ্ণ আর বাদামী মৃত্তিকা
এবং সপ্রেমে চাইবে নীলাভ-সবুজ মহাকাশে,
সে নয় অনেক দূরে,
একেবারে পাশে।

ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেঙ্কো
১৯৩৩-

অর্ধেক অকেজো

*　　　*　　　*

অর্ধেক অকেজো ! আমি ঘৃণা করি অর্ধ-উপহার !
সমস্ত আকাশ দাও ! করো সারা বিশ্ব উদ্ঘাটিত !
পর্বত এবং নদী, সমুদ্র ও রত্নরাজি তার
সকলি আমার ! তাতে যুগ্ম-সত্ত্ব হবে না স্বীকৃত !

জীবন, মধুর বাক্যে ভুলিয়ে দিয়ো না ফাঁকি মোটে !
দাও পূর্ণ তুলামূল্য ! এ কাঁধে সকলি পারি নিতে।
চাই না আনন্দ সেই, কিংবা হাসি, যাতে দ্বিধা ফোটে ;
কিংবা আধা-দুঃখ, তাও চাইনাকো আর্তির সংগীতে।

কেবল একটি 'আধা' স্বাগত— সে আধেক বালিশ—
যেখানে গালের পাশে চাপ দিয়ে নরম আদরে
তোমার আঙুল থেকে আংটি তার সোনালি পালিশ
ঝল্‌কায় ; এবং উল্কা, অসহায়, শুধু ঝরে পড়ে ॥

রুশরা যুদ্ধ চায় কি আরেকবার ?

বলো, রুশরা কি যুদ্ধ চাইছে আরেকবার ?—
যাও আমাদের দেশে, খোঁজো সেই জিজ্ঞাসার
জবাব, যেখানে স্তব্ধতা বুকে নিয়ে বাতাস
বার্চ্-পপ্‌লার গাছের শীর্ষে রুদ্ধশ্বাস।
তথায় এখনো শায়িত সৈন্য-যুবকদল,
পুত্র যাদের পিতার জবাব দেবে সফল।

জানার সীমানা বাড়বে— আগে যা জানতে তার।
বলো-না, রুশরা যুদ্ধ চায় কি আরেকবার?

ঐ সৈন্যেরা সবারই জন্যে দিয়েছে প্রাণ,
শুধুই দেশকে বাঁচাতে করে নি আত্মদান—
যাতে রাত্রিতে সারা বিশ্বই ঘুমোতে পারে,
যাতে ঘুম ভেঙে কাটাতে না-হয় অশ্রুধারে!
নিউ ইয়র্ক ও প্যারিস কাটায় রাত্রি আজ
গভীর ঘুমের তরুছায়ে, মনে আলোর নাচ।
তাদের স্বপ্নে জবাব শুনতে পাবে তোমার।
বলো-না, রুশরা যুদ্ধ চায় কি আরেকবার?

নিশ্চিত জানি, যুদ্ধে কী করে লড়তে হয়;
কিন্তু আমরা চাই না কখনো সেই সময়
যখন সৈন্য-যুবকেরা ঝরে পাতার মতো,
তাদের গ্রামে ও খামারেও জাগে রণক্ষত।
যাও জিজ্ঞাসা করো— সৈন্যের যারা জীবন—
আমার মাকে ও বৌকে প্রশ্ন করো, তখন
জবাব জানবে তোমার চরম জিজ্ঞাসার।
বলো-না, রুশরা যুদ্ধ চায় কি আরেকবার?

নোভেলা মাৎভেয়েভা
১৯৩৪-

বাঁধা কপিগুলি ঐ দেখায় বাহিরে

বাঁধা কপিগুলি ঐ দেখায় বাহিরে পাতা
কী রকম জানো—
এত পুরু যেন সেটা জুতোর তলার চামড়া, নতুন বানানো ;
এমন কর্কশ, যেন গালাগালি,
এত শক্ত— ডাকব্যাগ বুঝি ;
গায়ে তার শিরা, যেন দড়ি— যাতে
পাল বাঁধা থাকে সোজাসুজি।
বিরূপ ভাগ্যের সামনে দাঁড়িয়ে পাতারা
ঝড় বুকে নিচ্ছে খাড়া,
সমস্ত তোরণে তারা তুলে ধরছে ক্লান্তিহীন ঢালের পাহারা।
শক্ত-পায়ে আছে দেখো প্রতীক্ষায়—
যোদ্ধা যেন দুর্ধর্ষ, কঠিন !
আগলায় সতত তার নিহিত হৃদয় ঐ
রেশম-মসৃণ।

বারেক তুষার-শুভ্র সে হৃদয়
ভালো করে দেখে নিতে যেই
তার দিকে ঝুঁকে ধীরে
ভেঙেছি বাইরের দিকে পাতাখানি, আর
চোখের জলেরই মতো বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়ে
তার অশ্রু সেই।
আমার সার্টের হাতা ভেজায়, শিশির যেন,
ঘন শোক তার।
আবার ভাঙার শব্দ— দেখি আমি
কী আশ্চর্য সে গোলকধাঁধা,

নিরন্ত পাতার পরে পাতা খুললে থাকে তবু
পত্রজালে বাঁধা।
প্রতিরোধহীন তার মাথা যেন
যত অশ্রু ফেলে বারংবার,
আমারই দু হাতে মুখ লুকাতে সে চায় তবু, খোঁজে
ভয়ের উদ্ধার।

বেলা আখমাদুলিনা
১৯৩৭-

সোডা-জলের যন্ত্র

জনৈক দুর্বোধ মন একালের বাচ্চা ছেলে এল
সোডাজল-ঢালা এক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের এ ধারে,
আর 'ট্যাঙ্গারিন'-মার্কা পানীয় সে কিনল, একেবারে
খেলনায় দম-দেওয়া যেন, ঠিক তত সহজেই পেল।

যন্ত্রের সুড়ঙ্গে একটি কোপেক সে ঢোকাল কেবল,
অবিশ্বাস্য সে কাণ্ডেও বাচ্চাটা নিতান্ত অবিকার,
যন্ত্র যেন জিন্‌-দৈত্য, কলকব্জা-ঘেরা খেলোয়াড়,
তখনি গেলাস ভরে তীব্রবেগে ঢালে সোডাজল।

শিশুটির আস্থা দেখি এক ঘণ্টা চোখের উপরে !—
এক ঘণ্টা যেন তার অন্তরঙ্গ জাদুরাজ্যে বাস !
অথচ অক্ষম আমি ; এটা কি নিষ্ঠুর পরিহাস,
সে মিষ্টি ফোয়ারা হাতে ধরতেও পারি না ভালো করে !

এ শিশু অভাবনীয়ে আজন্ম অভ্যস্ত এতবার !
সাতটি পলতোলা সেই গেলাস সে তোলে কি সহজে !
সে সাত-ঢেউয়ের খাঁজে ভেঙে যায় আকাশী আলো যে !
ছুঁড়ে দেয় এ-মাটিতে সাতরঙা রামধনু তার।

শিশুর সাফল্যে আমি ঈর্ষা নিয়ে করি সে রকম ;
বুকটা ধুক ধুক করে ভয়ে, তবু নিয়েছি ঝুঁকি সে।
আমার কোপেক-চক্র যন্ত্রের সুড়ঙ্গে যায় মিশে :
অথবা সে যেন বাজি, ও-খেলার যা নাকি নিয়ম !

যেন অন্ধ কারাগার থেকে বন্দী জাগে অকস্মাৎ,
অজস্র তরল খুশি মুক্তি পেয়ে বেরোয় সবেগে
উচ্ছ্বসিত হাসি হয়ে, গোলাপি রক্তিমা তার লেগে
স্ফটিক নির্ঝরে জাগে উৎসারিত আনন্দ প্রপাত।

আমি সে অমৃতে স্বাদ নিতে গিয়ে ঠোঁটের উপরে
বুদ্‌বুদে বিলীয়মান স্পর্শ তার পাই তীব্র সুখে,
যেন সাতটি সুরভিত রামধনু আমার চুমুকে
পান করি বারংবার সসম্ভ্রমে পরম আদরে।

তামার ঝংকারে মৃদু শব্দ তোলে সোডার এ'কল,
এবং আমার দিকে নিরুৎসুক স্থির চেয়ে থাকে ;
যেন সে কৃষাণী মেয়ে, প্রচলিত সৌজন্যের ডাকে
পথিকের অঞ্জলিতে ঢেলে দেয় পিপাসার জল ॥

—

১ সিদিয়া

কৃষ্ণসাগরের উত্তরে দক্ষিণ ইয়োরোপের ভূখণ্ড, অর্থাৎ ক্রিমিয়া অঞ্চল। খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর আগে এখানে সিদিয়াবাসীরা একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। গ্রীকদের সঙ্গে এরা বাণিজ্য করত এবং তাদের হয়ে যুদ্ধবিগ্রহেও যোগ দিয়েছে। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পর এদের বিষয়ে আর কিছু জানা যায় না।

২ মেসিনা

ইতালি ও সিসিলির মধ্যে ২০ মাইল দীর্ঘ প্রণালী।

৩ ইডিপাস

গ্রীক পুরাণে কথিত থিবিসের রাজা। প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের 'ইডিপাস রেক্স' নাটকের নায়ক। ইডিপাসের পিতার নাম লাইয়াস এবং মায়ের নাম জোকাস্টা। দৈববাণীতে শোনা গিয়েছিল যে, ইডিপাস তাঁর পিতাকে হত্যা করবেন। তাতে তাঁর পিতা তাকে শিশুকালেই পাহাড়ে রেখে দেন, যাতে পুত্রের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু এক রাখালের যত্নে ইডিপাস রক্ষা পান।

৪ স্ফিংস

মিশরে পিরামিডের সামনে গিজেতে স্ফিংস আছে। এখানে বলা হচ্ছে গ্রীক স্ফিংসের কথা। এই স্ফিংস ডাইনী বিশেষ; তার মুখ নারীর, দেহ সিংহের ও এর কেশর আছে এবং সেইসঙ্গে আছে একজোড়া পাখা। গ্রীক স্ফিংস থিবিস রাজ্যের প্রভূত অকল্যাণ করতে থাকে। কিন্তু ইডিপাস তার ধাঁধার উত্তর দেবার পর সে শান্ত হয়। (তার ধাঁধা ছিল: সকালে চারপায়ে দুপুরে দুপায়ে এবং রাত্রে তিনপায়ে হাঁটে কী? উত্তর হল: মানুষ বাল্যে হামাগুড়ি দেয়, যৌবনে সোজাভাবে হাঁটে এবং বার্ধক্যে লাঠি নিয়ে চলে।)

৫ মঁমার্ত্র

প্যারিস শহরের একটি শৌখিন অঞ্চল।

৬ উরাল

রাশিয়ায় অবস্থিত পর্বতশ্রেণী। এশিয়া এবং ইয়োরোপের সীমান্তের বেশির ভাগই নির্মীত হয়েছে এই পর্বতমালার দ্বারা।

৭ আইসোল্ড ও ট্রিস্টান

মধ্যযুগীয় ব্রিটিশ গাথাকাব্যে বলা হয়েছে যে, ট্রিস্টান হল কর্নওয়ালের রাজা মার্ক্-এর দূত। তাঁকে পাঠানো হয়েছিল আয়র্ল্যাণ্ড থেকে আইসোল্ডকে ফিরিয়ে আনার জন্যে।

কিন্তু এক প্রেমোদ্রেককারী পানীয় গ্রহণ করার ফলে ট্রিস্টান ও আইসোল্ড পরস্পরের প্রেমে আত্মহারা হয়ে পড়েন।

৮ সিনাই

আকাবা উপসাগর ও সুয়েজখালের মধ্যে অবস্থিত পাহাড়। ইহুদীদের আদিগুরু মোজেজ এখানে ঈশ্বরের দেখা পান এবং তাঁর কাছ থেকে ধর্মনীতি লাভ করেন। এখানে মোজেজ 'জ্বলন্ত গুল্ম' দেখেছিলেন এবং পাথরের বুক থেকে জল উৎসারিত করেছিলেন।

৯ জিউস

প্রাচীন গ্রীকদের দেবরাজ। দেবগণ এবং মানুষের পরম পিতা। তাঁর মূর্তি কল্পনা করা হয়— তিনি সোনা বা হাতির দাঁতের সিংহাসনে বসে আছেন, এক হাতে তাঁর বজ্র, অন্য হাতে সাইপ্রেস শাখার দণ্ড, আর তাঁর পদতলে পাখা বিস্তার করে অপেক্ষা করছে একটি ঈগল পাখি। শুধু ভাগ্য ছাড়া আর সব-কিছুর উপরেই তাঁর আধিপত্য মনে করা হত অপ্রতিহত।

১০ লিলিথ

ইহুদী পুরাণ অনুসারে লিলিথ হলেন আদি মানব আদমের দ্বিতীয়া স্ত্রী। ইনি আগে ছিলেন শয়তানের স্ত্রী। ইনি আদমের প্রথমা স্ত্রী ঈভ-এর মতো আদমের আদেশ পালন করেন নি এবং আদমকে পরিত্যাগ করে চলে যান। পরে আদম এবং ঈভ ইডেন উদ্যান থেকে বহিষ্কৃত হলে লিলিথ আবার আদমের সঙ্গে মিলিত হন এবং দানবদের জন্ম দেন।

১১ বৈকল

রাশিয়ায় সাইবেরিয়া অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত মিষ্টিজলের হ্রদ। আয়তন বারো হাজারেরও বেশি বর্গ মাইল, পৃথিবীতে মিষ্টিজলের হ্রদের মধ্যে বৃহত্তম।

—